HUMAN PHYSIOLOGY

IN

BENGALI

BY

RAJ KRISHNA RAI CHOUDHUREE.

নরদেহ নির্ণয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

মিরজাপুর, অপর সরকিউলার রোড, নং ৫৯।

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

সন ১২৬৬ সাল।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

—

এক্ষণে আমাদিগের দেশে যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তৎসমূহে সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবিষয়ক অনেক গ্রন্থের অধ্যাপনা হইতেছে। শারীরবিধান মনুষ্যদিগের অবশ্য শিক্ষণীয়; সুতরাং সমুদায় বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যাশা ছিল, চিকিৎসাশাস্ত্র-ব্যবসায়ী কোন বিজ্ঞতম দেশীয় ডাক্তার বিদ্যা-লয়-সমূহে ব্যবহার জন্য দেশীয় ভাষায় তদ্বিষ-য়ক কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সেই প্রয়োজন সাধন করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহা-দিগের তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেখা যায় না। জেলা নদীয়ার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনিস্পেক্-টর শ্রীযুত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহা-শয়ের অনুরোধক্রমে ইংরেজী শারীরবিধান

গ্রন্থ হইতে আমি এই পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। ইংরেজী শারীরবিধান গ্রন্থে যে সকল বিষয় বিবৃত আছে, তাহার সমুদায় অংশ সুখ-বোধ্য নহে। সমুদায় বুঝিতে হইলে চিকিৎ-সাশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিতে ও শব ব্যব-চ্ছেদ দ্বারা অনেক বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখি-তে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ সকল বিদ্যালয়ে সেরূপে শিক্ষা-প্রদানের রীতি নাই এবং থা-কাও আবশ্যক নহে। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থী ভিন্ন শারীর-বিধান-বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান লাভ চেষ্টা করা অন্যের তত আবশ্যক নহে এবং তত অবকাশও হইয়া উঠে না। অতএব সে শাস্ত্রের বাহুল্য বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল অংশ অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে বিবেচনা করিয়াছি, ও সকলেরই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়াছি, তৎসমুদায় সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম। গ্রন্থ বালকদিগের পাঠোপযোগী করিতে পরিশ্রমের অল্পতা করি নাই। যে সকল শব্দের ইংরেজী প্রতিবাক্য লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে,

তৎসমুদায়ের প্রতিবাক্য এবং অগত্যা যে সকল ইংরেজী শব্দ ও দুরূহ বাঙ্গালা শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তাহার অর্থ পরিশিষ্টে লিখিয়া দিয়াছি। এক্ষণে লোকে কিরূপ ভাবে পুস্তকখানি গ্রহণ করেন বলিতে পারি না। যে কার্য্য চিকিৎসাশাস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের সম্পাদ্য মৎকর্তৃক তাহা সর্ব্বতোভাবে দোষশূন্য হইবে, এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তথাচ বিজ্ঞমণ্ডলীর নয়নপথে ইহা পতিত হইলে তাঁহারা দেখিয়া যদি ইহার সমুদায় ভাগ দোষময় না কহেন, এবং ইহাকে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পঠনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল ও এতদ্বিষয়ক পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্তি হইবে।

অনবধানতা এবং বর্ণযোজনার দোষবশতঃ যে যে স্থল অশুদ্ধ লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই স্থল সংশোধন করিয়া গ্রন্থের শেষে লিখিয়া দিয়াছি। পাঠকগণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে ঐ শোধনী-লিপি দেখিয়া সেই সেই স্থল সংশোধন করিয়া লইবেন।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি, উল্লিখিত ডেপুটী ইনিস্পেক্টর মহাশয় এই পুস্তকের সত্বর প্রণয়ন ও প্রচারণ-বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন; মহেশপুর বাঙ্গালা আদর্শ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়রা, বালকদিগের পাঠোপযুক্ত হইল কি না, দেখিবার নিমিত্ত পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ইহার অনেক অংশ পাঠ করিয়াছেন; এবং তত্রত্য প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন; অবশেষে গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার সময় সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার সমুদায় ভাগ দেখিয়া দিয়াছেন ও কোন কোন স্থল সংশোধন করিয়াছেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

মহেশপুর

৪ঠা চৈত্র ১২৬৬ সাল।

নরদেহ নির্ণয়।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

মনুষ্য, যে দেহ ধারণ করিয়া জগতীতলে সমুদায় জীবের উপরি প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন, যে দেহ অবলম্বন করিয়া ভূলোক ও দ্যুলোকের পরিমাণ স্থির করিতেছেন, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অবস্থান ও গতি নিরূপণ করিতেছেন, আশ্চর্য্য ক্রিয়াকাণ্ড সমাধা করিয়া আপন মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছেন এবং পৃথিবীর অতুল সুখভোগে সমর্থ হইয়াছেন, সেই দেহের তত্ত্ব অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ শারীর-তত্ত্বজ্ঞান আমাদিগের বিবিধ মহোপকারের প্রধান হেতু-ভূত। প্রথমতঃ তদ্দ্বারা আমাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ভূয়িষ্ঠ উপকার হয়। সুখ সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার জন্য স্বাস্থ্য যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

শরীর ও মন সুস্থ না থাকিলে কোন সুখসামগ্রীতেই সুখবোধ হয় না। কি প্রচুর ধন-সম্পত্তি, কি গৌরবান্বিত পদ, কি মনোহর বিলাস-সামগ্রী, সকলই বিরস বোধ হয়। তৎকালে বোধ হয়, পৃথিবীস্থ সকল পদার্থই যেন সুখপ্রদা-শক্তি-বিহীন হইয়াছে।

যে সুরভিময় বিচিত্রবর্ণ কুসুমস্তবক সুস্থাবস্থায় তাঁহার পরম প্রীতিকর বোধ হইত, অসুস্থাবস্থায় তাহাতে আর প্রীতি উদ্ভাবন করে না; যে সকল মধুর-স্বাদ ভোজন-সামগ্রী নিত্য-প্রিয় ছিল, তাহা বিস্বাদ বোধ হয়; যে সুমধুর সঙ্গীতরব, বীণাধ্বনি বা কোকিল-কূজিত, শ্রবণ-সুখ সম্পাদন করিত, তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠে; নানা মনোহর বর্ণরঞ্জিত আশ্চর্য্য-দর্শন যে সকল বস্তুদ্বারা নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত হইত, তাহা আর নেত্রাকর্ষণ করে না; যে সুকোমল সুখ-স্পর্শ শয্যা অন্তঃকরণ উল্লাসিত করিত, তাহাতেও কষ্টানুভব হয়; যে আমোদরব-পূর্ণ হাস্যময় বান্ধব-মণ্ডলী সদা সেব্য ছিল, তাহাতেও সুখবোধ হয় না। সর্ব্বদা অন্তঃকরণ বিষণ্ন, মুখশ্রী বিবর্ণ, নয়ন তেজঃ-শূন্য, থাকে। যথোচিতরূপে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি নিয়োজন, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করণ, বিদ্যোপার্জ্জন, বিষয়-কর্ম্মের উন্নতি সাধন, পরিবার প্রতিপালন, সন্তানদিগের বিদ্যোপার্জ্জনের সম্যক্ উপায় বিধান

এবং স্বদেশের উপকারজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কিছুই তৎকর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হয় না। ফলতঃ স্বাস্থ্যই আমাদিগের প্রকৃত জীবন। অসুস্থ শরীরে জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর।

অনেকে পীড়াকে শরীরের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। শরীর থাকিলেই পীড়া হয় নিশ্চয় করিয়া, তাঁহারা তাহা হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় চিন্তায় তাদৃশ যত্ন করেন না। কেহ বা পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মকে অথবা গ্রহবিশেষের কোপ-দৃষ্টিকে পীড়ার কারণ বলিয়া জানেন। তাঁহারা রোগ হইলে চিকিৎসার উপর তাদৃশ নির্ভর না করিয়া তাহার প্রশমনার্থে স্বস্ত্যয়নাদি করাইয়া থাকেন। রোগের কারণ এবং শারীরিক প্রকৃতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতেই আমাদিগের দেশে যে এই ভ্রম-মূলক বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা যে যে কার্য্যের কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হই, দুর্ব্বোধ দৈবশক্তি-বিশেষকে তাহার কারণ কল্পনা করিয়া লইয়া থাকি। বাষ্প-বিশেষের গুণে ব্যোম-যানে আরোহণ করিয়া আকাশ-মার্গে বিচরণ করা যায়, অথবা তার-বিশেষের সংযোগে এক স্থানের সংবাদ তথা হইতে সুদূর দেশে নিমেষ-মধ্যে প্রেরণ করা যায়, ইহা যে ব্যক্তি অবগত নহেন, তিনি তাহা

শুনিলে হয়ত অবিশ্বাসই করেন, অথবা কোন দৈব-শক্তিকে তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন আমেরিকেরা যখন প্রথমতঃ কামানধারী ইউরোপীয়দিগকে দেখিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে বিদ্যুদ্বজ্রপাণি দেবতা বিশেষ ভাবিয়াছিল। কামানের ও বারুদের গুণ জ্ঞাত থাকিলে, তাহারা কখনই তাহাদিগকে অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন বিবেচনা করিত না। আমাদিগের দেশে যে অনেক সামান্য ব্যাপার অদ্যাপি দেবশক্তিমূলক বলিয়া লোকের বোধ আছে, অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ। ফলতঃ শারীরিক প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে রোগোৎপত্তির কারণ ও নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা কখনই সম্ভাবিত নহে। কি কি পদার্থের সংযোগে শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিরূপে উহার উৎপত্তি বৃদ্ধি ও পোষণ হয়, তাহা না জানিলে, স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় অবধারিত হইতে পারে না।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষার দ্বিতীয় মহোপকার এই, দেহের নির্ম্মাণপ্রণালীতে অনন্তজ্ঞানশালী বিশ্বরচয়িতার অনুপম নির্ম্মাণকৌশল জানিতে পারিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি উদিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি মনুষ্য-দেহ নির্ম্মাণে যে কত কৌশলই প্রকাশ করি-

য়াছেন, তাহা ভাবনা করিতে গেলে অন্তঃকরণ বিস্ময়-রসে আপ্লাবিত হইতে থাকে। শরীরের এক এক অঙ্গ নির্ম্মাণে তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের ও অদ্ভুত কৌশ-লের পরিচয় বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শরী-রের বৃহৎ অস্থি অবধি শোণিতস্থ অতি সূক্ষ্ম ডিম্বপর্য্যন্ত সকলই তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞানের পরিচয় স্থান। এই পৃথিবীতে আমাদিগের যখন যেরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে, যাহার যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অভিরুচি হইবে, সেই অবস্থার উপযোগী, সেই ব্যবসায়ের উপযোগী, করিয়া তিনি আমাদিগের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শরীরের যে অঙ্গ যথায় স্থাপন করা উচিত, যে অঙ্গ যেরূপে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, তাঁহার অনন্ত কৌশলে তাহার কিছুরই ব্যতিক্রম হয় নাই।

আমাদিগের শরীর, কঠিন কোমল ও তরল পদার্থে নির্ম্মিত। কঠিন পদার্থগুলিকে অস্থি বলা যায়। অস্থিই শরীরের অপরাপর পদার্থের আধারস্বরূপ। তাহাতে শরীরের আকার নির্দ্দিষ্ট ও সঞ্চালন-ক্রিয়া নিয়মিত ও নির্ব্বাহিত হয়। অস্থি শরীরের অভ্য-ন্তরে আছে; অন্যান্য পদার্থগুলি তাহার অন্তর্ভাগে বা বহির্ভাগে সংলগ্ন থাকিয়া, আধেয় স্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করে, এবং কতকগুলি তত্রত্য ছিদ্রাদির

মধ্যে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্য সমাধা করে। স্ব স্ব স্থানে সন্নিবিষ্ট শরীরের অস্থি-সমষ্টিকে কঙ্কাল কহে। একখানি অস্থি অপর অস্থির সহিত যথায় সংযুক্ত আছে, তাহাকে সন্ধি কহা যায়। অনন্ত জ্ঞানশালী পরমেশ্বর সন্ধি রচনা বিষয়ে বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। একপ্রকার ভেদাবরোধক, সৌত্রিক ও স্থিতিস্থাপক গুণোপেত পদার্থদ্বারা অস্থির সংযোগ সম্পাদিত। ঐ সংযোজক পদার্থকে বন্ধনী কহে। বন্ধনী সকল এরূপ সুন্দররূপে অস্থিতে সম্বদ্ধ যে, সন্ধিস্থানের সচল অস্থিগুলি অনায়াসে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমা-মধ্যে সঞ্চালিত হইতে পারে। বন্ধনী স্থান-ভ্রষ্ট বা নষ্ট হইলেই অস্থিবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। একখানি অস্থি অপর অস্থি-মুখে ঘৃষ্ট না হয়, এই নিমিত্ত সন্ধিস্থলে উভয় অস্থির মধ্যে ভেদাবরোধক সৌত্রিক ও স্থিতিস্থাপক একপ্রকার কোমল পদার্থ আছে, উহাকে উপাস্থি কহে। বিশেষতঃ প্রত্যেক সন্ধিস্থলে একপ্রকার স্নৈহিক যন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা ডিম্বের মধ্যস্থ শুভ্র পদার্থের ন্যায় একপ্রকার তরল পদার্থ সন্ধিস্থলে নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, গাড়ীর আলে তৈল দিলে, তাহা যেমন অনায়াসে চক্রমধ্যে ভ্রামিত হয়, সেইরূপ সংযোজিত অস্থির অনায়াসে সঞ্চালন সমাধা করে। কেবল সন্ধিস্থলেই ঐ স্নৈহিক তরল

পদার্থ প্রবাহিত হয় এমত নহে, শরীরের যে যে স্থানে এক অঙ্গ অঙ্গান্তরের উপরি চালিত হয়, সেই সেই স্থলেই উহা প্রবাহিত হইয়া থাকে।

যে যন্ত্রদ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালন-ক্রিয়া সমাধা হয়, তাহাকে পেশী কহে, পেশী মাংসরাশি মাত্র, পশু-শরীরের ঐ পেশীই লোকে মাংস বলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। পার্শ্বাপার্শ্বি অবস্থিত সমান্তরাল মাংসসূত্র সংযোগে পেশী উৎপন্ন হয়। পেশী সকল দুই খণ্ড অস্থির মধ্যে বিস্তৃত থাকিয়া তাহার একখানি বা উভয় খণ্ডকেই সঞ্চালিত করে। প্রকৃত পেশী অস্থিতে সংযুক্ত থাকে না। উহার যে অন্তভাগ অস্থিতে সংযুক্ত থাকে, তাহার প্রকৃতি প্রকৃত পেশীর প্রকৃতি হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্। ঐ অন্তভাগ কোন কোন স্থলে শুভ্র রজ্জুবৎ প্রতীয়মান হয়; তাহাকে পেশীবন্ধনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা গেল। পেশীবন্ধনী অস্থিতে এরূপ দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, উহাকে অস্থি হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিলে উহা পৃথক্ না হইয়া বরং অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়। কোন কোন স্থলে পেশীর অন্তভাগ রজ্জুবৎ না হইয়া অধিক বা অল্প বিস্তৃত থাকে, এবং তখন উহা অস্থির বিন্দুমাত্র স্থলে সম্বদ্ধ না হইয়া, উহার বিস্তৃতির যে পরিমাণ সেই পরিমিত অস্থিমুখে সম্বদ্ধ থাকে। পেশীর

ঐরূপ অন্তভাগ দেখিতে বস্ত্রের মত বলিয়া, উহা পেশীচেল শব্দে অভিহিত হইল।

একখানি পেশীদ্বারা দুই খণ্ড অস্থি সংযুক্ত থাকিলে সচরাচর তাহার একখণ্ডমাত্র সঞ্চালিত হয়। যে অস্থি-খণ্ড চালিত হয়, তাহার যে স্থানে পেশী সম্বদ্ধ থাকে, সেই স্থানকে পেশী-নিবেশ এবং অপর অস্থিখণ্ডের যে স্থানে সংযুক্ত থাকে, তাহাকে পেশীমূল কহে।

পেশীর একপ্রকার বিশেষ গুণ আছে। উহাকে সঙ্কোচ্যতা কহে। পেশীবটী বা পেশীচেলে এবং শরীরের অন্য কোন ভাগে ঐ সঙ্কোচ্যতা গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সঙ্কোচ্যতাগুণ থাকাতেই পেশীদ্বারা অস্থি সকল চালিত হইয়া থাকে। যে অস্থি একবার একদিকে, একবার তাহার বিপরীত দিকে, চালিত হয়, তাহার উভয় দিকে দুইখানি পেশী নিবদ্ধ থাকে। অস্থি যে অভিমুখে চালিত হইবে, সেই মুখে তদভিমুখচালনী পেশীর নিবেশ-মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ অস্থির উভয় মুখে পেশী-মূল ও পেশী-নিবেশ নিরীক্ষিত হয়। এইরূপ বিরুদ্ধ-দিক্-চালনী পেশীদিগকে বিপরীতা-চারী কহা যায়। যে অস্থি নানা দিকে চালিত হয় তাহা যত ভিন্ন দিকে চালিত হইয়া থাকে, তত পেশী-দ্বারা তাহার সঞ্চালন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

কখন কখন দুই বা ততোধিক পেশী একত্রিত হইয়া, একখানি অস্থিকে এক দিকে চালিত করিয়া থাকে; সেই সকল পেশীকে একযোগী পেশী কহা যাইতে পারে।

কোন কোন পেশী আমাদিগের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। উহাদিগকে ঐচ্ছিক পেশী কহে। আর যাহারা ইচ্ছাধীন না হইয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে অনৈচ্ছিক পেশী কহা যায়। হস্তপদাদি যে সকল পশীদ্বারা চালিত হয়, তাহারা ঐচ্ছিক শ্রেণীভুক্ত; আর যাহারা শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াদির কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহারা অনৈচ্ছিক-শ্রেণী-নিবিষ্ট।

শরীর-নির্ম্মাতার এমনি অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল, যে সকল পেশী আমাদিগের ইচ্ছার অধীন নহে, তাহারা নিয়তই কার্য্য করিতেছে, তথাচ শ্রান্ত হয় না, তিনি তাহাদিগের কার্য্যকালের মধ্যে অবসর কালও প্রদান করিয়াছেন, সেই অবসরকালে তাহারা শ্রান্তি দূর করিয়া লয়। আমাদিগের হৃদয় অনৈচ্ছিক পেশীদ্বারা চালিত হয়। বক্ষঃস্থলে হস্তস্পর্শ করিলে, হৃদয়ের এক প্রকার চালনা হইতেছে, অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ চালনা নিরন্তর বোধ হয় না। একবার চালিত হইতে যত পরমিত কাল লাগে, একবার চালনার পর, সেই পরিমিত কাল উহার বিরতি অনুভব

হয়। ঐ বিরতিকাল-মধ্যে পেশীর একবার চালনা শ্রান্তি প্রশমিত হইয়া থাকে।

যে তরল পদার্থদ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, তাহাকে রক্ত কহে। হৃদয়, রক্তের প্রধান আশ্রয়-স্থান। হৃদয়স্থ পেশীবলে উহা তথাহইতে দেহের সর্ব্বাবয়বে সঞ্চালিত হয়। যেসকল নাড়ীদ্বারা দেহমধ্যে রক্তসঞ্চার হয়, তাহাদিগকে রক্তবহ নাড়ী কহে। রক্তবহ নাড়ী সমুদায় দুই প্রকার। হৃদয় হইতে একপ্রকার নাড়ীদ্বারা দেহের সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চালিত হয়, এবং আর এক প্রকার নাড়ীদ্বারা দেহভ্রান্ত রক্ত পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনীত হয়। যদ্দ্বারা হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকে ধমনী এবং যদ্দ্বারা দেহভ্রান্ত রক্ত হৃদয়ে প্রত্যাগমন করে, তাহাদিগকে শিরা কহে। ধমনীর প্রারম্ভ-স্থল স্থূল, কিন্তু শরীরের সমুদায় অংশে যত ব্যাপ্ত হইয়াছে, ততই, ক্রমশঃ নানা শাখায় বিভক্ত ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে কেশবৎ নাড়ীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ কেশবৎ নাড়ীদিগকে কৈশিকা শব্দে পরিচিত করা গেল। কৈশিকা নাড়ী এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। শোণিত, কৈশিকা পরিভ্রমণ করিয়া শিরায় গমন করে। কৈশিকা যে স্থলে শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাই শিরার-প্রারম্ভস্থল বলিয়া গণনীয়। প্রারম্ভ-

স্থলে শিরা সমুদায়ও কেশবৎ সূক্ষ্ম, তৎপরে ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ধমনীপথে শরীর ভ্রমণকালে রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ দেহে যোজিত হইয়া বৃদ্ধ শরীরের অপচিত অংশ পরিপূরণ ও শিশু-দেহের সম্বর্দ্ধন করে। ধমনী পরিত্যাগ করিয়া শিরায় গমন কালে রক্তের প্রকৃতি ভূয়িষ্ঠ পরিবর্ত্তিত হয়। রক্ত যে পুষ্টিকর পদার্থ সম্পন্ন হইয়া হৃদয় হইতে ধমনীতে গমন করে, তাহা পরিশূন্য হয়, এবং উহার বর্ণ পূর্ব্বে যাহা উজ্জ্বল লোহিত ছিল, তাহা কালিমা বিশিষ্ট হয়। রক্ত শিরা-দ্বারা হৃদয়ে নীত হইয়া, তথায় সংশোধিত ও পুনর্ব্বার পোষণী শক্তি সম্পন্ন হইয়া ধমনী-পথে পুনর্ব্বার সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

পোষণী-শক্তি বিহীন বিবর্ণ শোণিত, শিরা-পথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে পদার্থান্তরের সহিত মিলিত হয়। ঐ পদার্থকে লসীকা কহে। লসীকা এক প্রকার বর্ণ-বিহীন জলের ন্যায় তরল পদার্থ। কোন কোন স্থানে উহা ঈষৎ শ্বেতবর্ণও নিরীক্ষিত হয়। লসীকা শরীরের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত আছে। যে সকল নাড়ীদ্বারা লসীকা প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে লসীকা-বহ কহে। শিরার ন্যায় প্রথমতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীদ্বারা লসীকা প্রবাহিত হইয়া বৃহৎ নাড়ীতে গমন করে।

লসীকা রক্তের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে অন্ন-রসের সহিত সংযুক্ত হয়। ভুক্ত দ্রব্য পাকাশয়-মধ্য দিয়া গমনকালে তাহা হইতে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয়। উহাকে অন্নরস কহে। ঐ রস পাকাশয়ের গাত্র উদ্ভেদ করিয়া বহির্গত ও তল্লগ্ন নাড়ী-বিশেষে শোষিত হয়। ঐ সকল নাড়ীকে শোষণী নাড়ী কহে। অন্নরস শোষণী নাড়ী দিয়া প্রবাহিত হইয়া লসীকা-বহ নাড়ীতে গিয়া লসীকার সহিত মিশ্রিত হয়। শিরা যে স্থলে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকট লসীকাবহের সহিত উহার মিলন আছে; সুতরাং শিরাস্থ রক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই লসীকার সহিত মিশ্রিত হয়। এবং তাহাতেই রক্ত পুনর্ব্বার পোষণী-শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শিরাদ্বারা হৃদয়ে শোণিত সঞ্চালিত হইলে, উহা তত্রত্য পেশীবলে কতকগুলি নাড়ী দিয়া ফুস্‌ফুসে গমন করে, ঐ সকল নাড়ীকে ফুস্‌ফুসীয় ধমনী কহে। ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হইলে নিশ্বসিত বায়ুদ্বারা রক্তের পরিশোধন হয়। পরিশোধিত হইলেই, উহা উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া, আর একপ্রকার প্রণালী দ্বারা হৃদয়ের গহ্বরান্তরে প্রবিষ্ট হয়। ঐ প্রণালীকে ফুস্‌ফুসীয় শিরা কহে। অনন্তর রক্ত পুনর্ব্বার ধমনী-পথে দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া হৃদয়ে প্রত্যা-

বর্ত্তন করে। এইরূপে শরীরমধ্যে রক্তসঞ্চার হইয়া থাকে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত রক্তসঞ্চারের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে বায়ু নিশ্বাস ক্রিয়াদ্বারা আমাদিগের শরীরস্থ হয়, প্রধানতঃ তাহাতে বিবিধ পদার্থ থাকে; অম্লজান বায়ু ও যবক্ষারজান বায়ু। ফুস্ ফুস কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষপূর্ণ; নিশ্বসিত বায়ুর অম্ল-জান ভাগ, সেই সকল কোষের গাত্রাভ্যন্তর দিয়া তত্রাগত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, তাহার পরি-শোধন করে। দেহভ্রান্ত দূষিত রক্তে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বায়ু নামক এক প্রকার অনিষ্টকর পদার্থ থাকে, তাহা-ও সেই সময়ে রক্ত হইতে পৃথক্ হইয়া প্রশ্বসিত বায়ু সহযোগে বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে শোণিত দুষ্ট পদার্থ শূন্য ও পুষ্টিকর পদার্থ সংযুক্ত হইয়া বার-ম্বার শরীরমধ্যে সঞ্চালিত হয়।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, পেশী ও তাহার সঙ্কোচ্যতা শক্তি প্রভাবে শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু কিরূপে পেশীর সঙ্কোচন-প্রবৃত্তি জন্মে, কি রূপেই বা ইচ্ছামাত্র শরীরস্থ একটী বা শত শত পেশী এককালে সঙ্কুচিত হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার একটী চমৎকার যন্ত্রদ্বারা সম্পাদিত

হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রকে স্নায়ু কহে। স্নায়ু অতি সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রময় মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানেই ব্যাপ্ত হইয়াছে। মস্তিষ্ক আমাদিগের মনোযন্ত্র; অতএব মনোমধ্যে কোন অঙ্গ পরিচালনের ইচ্ছা হইলে, সেই ইচ্ছা যেন স্নায়ু সহযোগে সেই অঙ্গে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য পেশীকে সঙ্কুচিত হইতে আদেশ করিতে থাকে, এবং সেই আদেশানুবর্ত্তন করিয়া পেশী সঙ্কুচিত হইয়া সেই অঙ্গকে চালিত করে।

শরীরের অঙ্গাদি চালনা করা যেমন স্নায়ুর কার্য্য, সেইরূপ শরীরের কোন অংশে বাহ্য বা আন্তরিক কারণে কোন প্রকার ভাবান্তর হইলে, মনোমধ্যে তদ্বোধ সম্বেদন করাও স্নায়ুর কার্য্য। যখন আমরা কোন বস্তু দর্শন করি, তখন দৃষ্টবস্তুর প্রতিকৃতি নেত্রমধ্যে পতিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়স্থ স্নায়ুর ভাবান্তর করিলেই আমাদিগের দর্শন জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ে কোন শব্দের প্রতিঘাত ও নাসাভ্যন্তরে গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যের পরমাণু যোগ হইলে তত্তৎস্থানীয় স্নায়ু সহকারে আমাদিগের মনে সেই সেই ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান জন্মে। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্নায়ুদ্বারা কেবল শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়, এমত নহে; উহা দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন,

প্রভৃতি জ্ঞান জননেরও সাধন। কিন্তু ঐ উভয় প্রকার কার্য্য একরূপ স্নায়ুদ্বারা নিষ্পাদিত হয় না। শারীর-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে ঐ উভয় প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্নায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা দ্বারা সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকে গতিজননী, ও যদ্দ্বারা দর্শনাদি জ্ঞান জন্মে তাহাকে জ্ঞান-জননী স্নায়ু কহে।

মনোগত ইচ্ছা স্নায়ুযোগে পেশীতে সম্বেদিত হয়, এবং কোন অঙ্গের কোনরূপে ভাবান্তর হইলে স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে তদ্বোধ জন্মে, ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি কোন অঙ্গের স্নায়ু কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই অঙ্গ গতিরহিত ও অসাড় হইয়া উঠে।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, লসীকাবহ নাড়ীদ্বারা শিরাস্থ রক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থের সংযোগ হয়, তাহা অন্নহইতে জন্মে। আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করি, পাক-যন্ত্রদ্বারা তাহা হইতে ঐ পুষ্টিকর পদার্থ সঙ্কলিত হয়; অসারভাগ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। অন্ননালী, আমাশয়, অন্ত্র, যকৃৎ, পাললিক প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা ঐ পাককার্য্য সমাধা হয়।

মুখহইতে যে নালীদ্বারা অন্ন আমাশয়ে নীত হয় তাহাকে অন্ননালী কহা যায়। ঐ অন্ননালীর সহিত

সংলগ্ন এবং ফুস্‌ফুস ও হৃদয়ের অব্যবহিত নিম্নে আমাশয় অবস্থিত। আমাশয় হইতে একটী সুদীর্ঘ নল অবনামিত হইয়াছে, উহাকে অন্ত্র কহে। অন্ত্র সুদীর্ঘ, কিন্তু জড়িতাকারে উদরের নিম্নভাগে সংস্থিত। অন্ত্রের সহিত যকৃৎ ও পাললিকের সংযোগ আছে। প্রথমতঃ চর্ব্বণকালে লালার সহিত অন্নের সংযোগ হইয়া উহা অন্ন-নালীদ্বারা আমাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। তথায় উহার পরিপাকের অনেক কার্য্য সমাধা হয়। অনন্তর, আমাশয় হইতে অন্ত্রমধ্যে গমনকালে যকৃৎ, পাললিক এবং অন্ত্রের গাত্রহইতে রস নির্গত হইয়া উহার সহিত মিলিত হইতে থাকে। ঐ সকল রস সংযোগে অন্নের পরিপাক-কার্য্য সমাধা হয়। আমাশয় ও অন্নের অভ্যন্তর দিয়া গমনকালে অন্নহইতে পুষ্টিকর পদার্থ পৃথক্ হইয়া এক প্রকার কৈশিক আকর্ষণদ্বারা আমাশয় ও অন্ত্রের গাত্র দিয়া বহির্গত হইয়া তৎসংলগ্ন অসংখ্য শোষণী নাড়ীদ্বারা লসীকাবহ নাড়ীতে সঞ্চরণ করে। এবং তাহার পর লসীকা সহযোগে শরীর-ভ্রান্ত শিরাস্থ শোণিতের সহিত হৃদয়ের নিকট মিলিত হইয়া তাহার পোষণী-শক্তি সম্পাদন করে।

এইরূপ অশেষ কৌশলদ্বারা করুণানিধান বিশ্বপাতা আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতেছেন। শরীরমধ্যে

যে, কত প্রকার চমৎকার কৌশল আছে, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অদ্যাপি সম্যক রূপে অবধারিত হয় নাই। এই গ্রন্থে শরীর-সম্বন্ধীয় যে সকল স্থূল স্থূল বিষয় বিবৃত হইল, তাহার মধ্যেও তাঁহার অনন্ত-জ্ঞানের ও অপরিসীম করুণার লক্ষণ পরিস্ফুটরূপে প্রতীয়মান হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অস্থি-সন্ধি-বন্ধনী।

অস্থি ত্রিবিধ পদার্থসংযোগে উৎপন্ন হয়—সৌত্রিক, ঔপাস্থিক ও পার্থিব। এই ত্রিবিধ পদার্থ হইতে উহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণ জন্মে। সৌত্রিক পদার্থের দ্বারা উহার ভেদাবরোধকত্ব, ঔপাস্থিক হইতে স্থিতি-স্থাপকত্ব এবং পার্থিব হইতে দৃঢ়তা ও কাঠিন্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ পদার্থত্রয়ের ভাগ-পরিমাণের ভিন্নতা অনুসারে অস্থির ঐ ঐ গুণের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীরের সকল অস্থিতে তাহার নির্ম্মাণ পদার্থের ভাগ সমানরূপ নাই। ভিন্ন ভিন্ন বয়সেও কোন অস্থিতে কোন পদার্থের আধিক্য ও পদার্থান্তরের অল্পতা দেখা যায়। মস্তকের যে অস্থির উপর শ্রবণেন্দ্রিয় আরোপিত, তাহা শরীরের সমুদায় অস্থি অপেক্ষা কঠিন। শিশু-শরীরের অস্থি-নিচয় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরাস্থি অপেক্ষা কোমল, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তকৌশলী পরমেশ্বর বয়োবিশেষে ও কার্য্যকারিতা বিশেষে অস্থিতে তন্নির্ম্মাণ পদার্থত্রয়ের ভাগ-পরিমাণের এমনই তারতম্য করিয়া দিয়াছেন, যে বয়সে ও যে কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অস্থির যে পরিমিত কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা ও ভেদাবরোধকত্ব থাকা আবশ্যক, উহাতে তাহাই লক্ষিত হয়। শিশুরা সর্ব্বদা ধাবন ও কূর্দ্দন করিতে ভালবাসে, তাহাদিগের বুদ্ধিপ্রভা সমীক্ষাকারিতা ও সাবধানতাগুণে তখনও পর্য্যাপ্ত ভূষিত হয় না, সুতরাং সদা চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাহাদিগের শরীরে সর্ব্বদা আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। সকলেই দেখিয়াছেন, শিশুরা গমন করিতে শিক্ষা করিবার সময় বা তাহার পর ধাবনাদি ক্রিয়ায় সর্ব্বদা পড়িয়া গিয়া থাকে। তৎকালে তাহাদিগের শরীরাস্থি কঠিন ও দৃঢ় হইলে আঘাতে চূর্ণ হইয়া

যাইতে পারে, এই নিমিত্ত তৎপ্রতিবিধানার্থে করুণাবান্ পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীরাস্থিতে ঔপাস্থিক পদার্থের আধিক্য রাখিয়াছেন। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরাস্থিতে ঐ পদার্থ যত থাকে, শিশু-শরীরে তাহা অপেক্ষা অধিক থাকায়, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুদিগের দেহাস্থি কোমল, স্থিতিস্থাপক ও নমনীয় থাকে। তাহাতেই পূর্ণবয়সে কোন উচ্চ-স্থান হইতে পড়িলে, যেরূপ আহত হওয়ার সম্ভাবনা, শৈশবকালে তাহা থাকে না; এবং এই নিমিত্তই বয়স্ক ব্যক্তি পড়িয়া গিয়া যত কষ্ট পায়, শিশুরা তত কষ্ট অনুভব করে না। পতিত হইবা মাত্র, উহারা আপনা হইতেই উঠিয়া, পূর্ব্ববৎ ক্রীড়াসক্ত হয়।

অনন্তর যত বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই শরীরের ভার বৃদ্ধি ও সাংসারিক কার্য্যানুরতি বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন শরীরের ভার বহন ও সাংসারিক কার্য্যানুষ্ঠান করিতে অধিক বলের আবশ্যক হয়। এই নিমিত্ত, তখন অস্থিতে সৌত্রিক ও পার্থিব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া, উহার বলবৃদ্ধি হয়। পার্থিব ও সৌত্রিক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ ঔপাস্থিক পদার্থের অভাব হয় না। তাহাতেই যৌবন কালে অস্থিসমূহের আবশ্যকমত বলবত্তা, দৃঢ়তা, নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা জন্মিয়া থাকে।

বৃদ্ধকালে জ্ঞান ও শান্তি-রসের বৃদ্ধি হয়। তখন যৌবন-সুলভ উগ্রতা ও কার্য্যপরতা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং শরীরে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা অল্প হয়। তৎকালে শরীরের ভারও বৃদ্ধি হইতে থাকে, অতএব তখন অস্থিনিবহে পার্থিব পদার্থের বৃদ্ধি ও ঔপাস্থিক পদার্থের হ্রাস হইয়া, তৎসমুদায় কঠিন হইতে থাকে। এই জন্যই, বৃদ্ধবয়সে কোন অস্থিতে আঘাত লাগিলে তাহা ভগ্ন হইয়া যায়।

বয়োনুসারে অস্থিতে তন্নির্ম্মাণ পদার্থত্রয়ের তারতম্য যেমন আমাদিগের কল্যাণের জন্য কল্পিত, কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সেও শারীরিক বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সেইরূপ ইতরবিশেষ আবশ্যক। শব্দিত বায়ুপ্রবাহ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণাধার অস্থি স্পন্দিত করিলে আমাদিগের শ্রবণক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বায়ুহিল্লোলে অস্থির স্পন্দন তাহার কাঠিন্য ও ঘনত্ব-গুণের উপর নির্ভর করে; সুতরাং কর্ণাধার অস্থির বিশেষরূপ সেই সেই গুণ প্রয়োজনীয়; সেই প্রয়োজন সাধন জন্যই জগদীশ্বর অপরাপর অস্থি-হইতে উহাকে প্রস্তরবৎ ঘন ও কঠিন করিয়াছেন। কফোণি ও পার্ষ্ণি-দেশীয় অস্থি সর্ব্বদা সঞ্চালিত হয়, বলিয়া, উহাদিগের ভেদাবরোধকত্ব গুণ অধিক থাকা আবশ্যক; এবং সেই নিমিত্তই তত্তৎস্থানীয় অস্থিতে

সৌত্রিক পদার্থের ভাগ অধিক হইয়াছে, উরু ও জঙ্ঘার অস্থি দেহভার ধারণের স্তম্ভস্বরূপ, অতএব উহাদিগের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য তাহাতে অধিক পরিমিত পার্থিব পদার্থ আছে।

অস্থির কার্য্যকারিতা যেমন তাহার নির্ম্মাণ-সামগ্রীর ভাগ-পরিমাণের ন্যূনাধিক্যের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ তাহার গঠনপ্রকার ও আকৃতির উপর নির্ভর করে। একখণ্ড অস্থিকে ঊর্দ্ধাধোভাগে চিরিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, অস্থির বহির্দ্দেশের সহিত অন্তর্দ্দেশের নির্ম্মাণ-প্রকারের সমতা নাই, বহির্দ্দেশের পরমাণু সমুদায় হস্তিদন্তের পরমাণুর ন্যায় ঘন এবং অন্তর্দ্দেশ জালবৎ সচ্ছিদ্র। অল্প ভার ও অধিক বলশালিতা একাধারে সমাবেশ জন্য অস্থির গঠনপ্রকার এইরূপ হওয়া আবশ্যক বলিয়াই অনন্ত-কৌশলকারী জগদীশ্বর অস্থি নির্ম্মাণে এই অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। অস্থির গঠনপ্রকার এইরূপ না হইয়া যদি উহার সমুদায় পরমাণু ঘনীভূত হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে অনর্থক অধিক পরিমিত শরীরভার বহন করিতে হইত। যে সকল অঙ্গ এক্ষণে সহজে চালনা করিতেছি, তচ্চালনা আমাদিগের অপেক্ষাকৃত কষ্টকর হইত।

যদি সকল অস্থির সকল দিকে সমানরূপ কার্য্য-

কারিতা থাকিত, তবে তাহাদিগের আকৃতি নলবৎ গোলাকার অথবা অন্যরূপ একাকৃতি হইত, এবং সকল ভাগের পরমাণু সমান ঘন থাকিত। কিন্তু সেরূপ সকল দিকে সমান কার্য্যকারিতা না থাকায় সেরূপ হয় নাই। যে অস্থির যে পার্শ্বে অধিক বাহ্য আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, সেই অস্থির সেই পার্শ্ব অপেক্ষাকৃত ঘন ও পুরু।

দুই বা ততোধিক অস্থিখণ্ড যে স্থলে পরস্পর সংলগ্ন থাকে, তাহাকে সন্ধি কহে। শরীরস্থ সমুদায় সন্ধিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; অচল-সন্ধি, চল-সন্ধি, ও ঈষচ্চল-সন্ধি। করোটীর অস্থির সংযোগ-স্থল, অচল-সন্ধির দৃষ্টান্ত ; জত্রু, কফোণি, ধক্ষণ, জানু প্রভৃতি চলসন্ধির উদাহরণ, এবং পৃষ্ঠবংশের কশেরুকা সমুদায়ের সন্ধি, ঈষচ্চল বলিয়া আখ্যাত।

যে উপায়ে অস্থি সমুদায় পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে, তাহাকে বন্ধনী কহে। বন্ধনী সমুদায় উজ্জ্বল, ও স্থিতিস্থাপকতা রহিত। সকল বন্ধনীর আকার সমানরূপ নহে। উহাদিগকে শরীরের কোন স্থানে স্থূল, কোন স্থানে বিস্তৃত, কোথাও দীর্ঘ,কোথাও বা হ্রস্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল বন্ধনীদ্বারা যে সকল অস্থি সংযুক্ত থাকে, প্রায় সেই সকল অস্থির নামানুসারে বন্ধনীর নামকরণ হইয়া থাকে। যথা পৃষ্ঠবংশীয়

বন্ধনী, কশেরুকান্তর-বন্ধনী কটিত্রিক-বন্ধনী ইত্যাদি।

আমাদিগের শরীরে ১৯৮ খণ্ড প্রধান অস্থি আছে। যথা

মেরুদণ্ডে বা পৃষ্ঠবংশে	২৬	পর্শুকায়	২৪
করোটীতে	৮	বুক্কাস্থি	১
মুখমণ্ডলে	১৪	বাহুদ্বয়ে*	৬৪
গ্রীবায়	১	পাদদ্বয়ে*	৬০
			১৯৮

এই সকল অস্থি ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-বিশেষ-সাধনজন্য আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে; এস্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করা গেলনা।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; স্ব স্ব স্থানে সন্নিবিষ্ট শরীরাস্থি সমুদায়কে কঙ্কাল কহে। শারীর-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা শরীরের ন্যায় কঙ্কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মস্তক, মধ্যকায়, ও বাহু।

গলদেশের উপরিস্থ সমুদায় ভাগকে মস্তক কহে। মস্তকের নিম্নহইতে ত্রিকাস্থি পর্য্যন্ত বাহু পাদ ব্যতীত সমুদায় ভাগ মধ্যকায় শব্দে নির্দ্দিষ্ট; এবং স্কন্ধ

---

* বাহুমূল হইতে হস্তাঙ্গুলি ও ঊরুমূল হইতে পদাঙ্গুলির সীমা পর্য্যন্ত বুঝায়, বাঙ্গলা ভাষায় এমত শব্দ নাই, কিন্তু এই পুস্তকে ঐ স্থানদ্বয় ক্রমান্বয়ে বাহু ও পাদ শব্দে নির্দ্দিষ্টহইল॥

হইতে করাঙ্গুলির শেষ পর্য্যন্ত ও উরুমূল হইতে পদাঙ্গুলির অগ্রপর্য্যন্ত, পাদ বলিয়া অভিহিত।

বিস্তারিত বুঝাইবার জন্য মস্তককে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, করোটী ও মুখমণ্ডল। মস্তকের উপরিভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ লইয়া করোটী গণনীয়। উহা অস্থিময় ও শূন্যগর্ভ। উহার উপরিভাগ ডিম্ববৎ গোলাকার এবং সম্মুখভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগ বিস্তৃত। নাসিকা ও ভ্রূদেশের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক বেষ্টন করিয়া অবটুর উপরিস্থ সীমাপর্য্যন্ত এবং এক কর্ণ হইতে কর্ণান্তর পর্য্যন্ত যে সকল অস্থি দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় করোটীর বহির্বেষ্টন। ঐ সকল অস্থির নিম্নদেশ-সম্বদ্ধ করোটীর একটী অস্থিময় মেজে আছে। এইরূপ অবরুদ্ধ স্থানে মস্তিষ্ক নিহিত হইয়াছে। করোটীর অস্থি-সঙ্খ্যা ৮আট। নিবেশ স্থান বা আকারানুসারে করোটীর অস্থিদিগের নামকরণ হইয়াছে। যথা, ললাটাস্থি, পশ্চাৎকপালাস্থি, বহুচ্ছিদ্রাস্থি, পার্শ্বকপালাস্থি ও শঙ্খাস্থি। এই সকল অস্থির মধ্যে কেবল পার্শ্বকপালাস্থি ও শঙ্খাস্থি দুইখানি করিয়া আছে, তদ্ভিন্ন সমুদায়গুলি এক একখানি মাত্র। ঐ সকল অস্থি পরস্পর এরূপ দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে তন্নির্ম্মিত কক্ষ্যামধ্যগত মস্তিষ্ক বাহ্য আঘাত হইতে নির্ব্বিঘ্নিত থাকে।

করোটী-সন্ধি। যে অস্থিগুলি দ্বারা করোটীর বহির্বেষ্টন সম্পাদিত, তাহারা প্রায় এরূপে সম্বদ্ধ যে দেখিলে তাহাদিগের সংযোগস্থল স্যুতিক্রিয়া সম্পন্ন বোধ হয়। এইজন্য তাহাদিগের সংযোগ-স্থলকে স্যুতসন্ধি কহে। দুইখানি করাত যদি এইরূপে স্থাপন করা যায়, যে, একখানির দাঁতগুলি অপর খানির দাঁতগুলির অবকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাহইলে তদুভয় যেরূপ সম্বদ্ধ হয়, করোটীর ললাটাস্থি, পাশ্চাৎ কপালাস্থি ও বহুচ্ছিদ্রাস্থির পরস্পর সংযোগও সেই রূপে সম্পাদিত; কেবল এই বিশেষ, করাতের দাঁতগুলি যেরূপ সূচাল, উহাদিগের বন্ধনদাঁত সেরূপ নহে, সেই সকল দাঁতের অগ্রভাগ মূল অপেক্ষা বিস্তৃত। ঐ সকল অস্থির সংযোগ সকল স্থানেই একরূপ নহে। কোন কোন স্থলে বহুচ্ছিদ্রাস্থির সীমাভাগ ললাটাস্থির উপরি, কোন স্থলে শঙ্খাস্থির সীমা বহুচ্ছিদ্রাস্থির উপরি, ও স্থলান্তরে ললাটাস্থির অন্তভাগ বহুচ্ছিদ্রাস্থির উপরি, সম্বদ্ধ থাকে। মস্তিষ্কবেষ্টনকারী অস্থি সকল এইরূপে সম্বদ্ধ বলিয়া উহারা সহজে বিশ্লিষ্ট হয় না। উহাদিগের বন্ধন দন্তাগ্র বিস্তৃত হওয়ায় কোন রূপ আঘাতে একখানি অপর খানি হইতে খুলিয়া যায় না। এবং স্থলবিশেষে উহাদিগের এক খানির একাংশ, অপর খানির উপরি সম্বদ্ধ থাকায়

একখানি অপর খানির অধঃপতিত বা উপরি উত্থিত হইতে পারে না। এই প্রকার দৃঢ়রূপ সম্বদ্ধ অস্থি-বেষ্টন দ্বারা আমাদিগের মনোযন্ত্র মস্তিষ্ক সংরক্ষিত হইয়াছে।

মুখমণ্ডল। করোটী ভিন্ন মস্তকের অপর-ভাগকে মুখমণ্ডল কহে। নিম্ন চোয়ালের অস্থি ভিন্ন মুখ-মণ্ডলের অস্থি সকল করোটী অস্থির সহিত এরূপ দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, কোন দিকে চালিত হইতে পারে না। মুখ-মণ্ডলের অস্থি-নিচয়মধ্যে কেবল নিম্ন চোয়ালের অস্থি সচল। মুখ-মণ্ডলে ৫টী বড় গহ্বর আছে। ঐ গহ্বর-চয়ের সহিত করোটীর অন্তর্গত মস্তিষ্কের সংযোগ-পথ আছে, এবং উহারা আমাদিগের কয়েকটী প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আবাস স্থান। সর্ব্বোপরিস্থ গহ্বরে চক্ষুর্দ্বয় অবস্থিত; তাহার নিম্নে নাসারন্ধ্র; এবং তদধঃ স্বাদেন্দ্রিয় সংস্থিত।

দন্ত। মনুষ্যের জন্মকালেই ২০টী দন্ত মুখ-মণ্ডলে মাঢ়ির মধ্যে থাকে, দশটী উপরের চোয়ালে ও দশটী অধঃস্থ চোয়ালে। ঐ সকল দন্ত মাঢ়ির অভ্যন্তরে থাকে বলিয়া শিশুমুখ স্তন্যপানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত থাকে। পরমেশ্বরের এমনই অপার করুণা, তিনি শিশুমুখে দন্তগুলি মাঢ়িমাংস নিহিত রাখিয়া, যেমন তাহাদিগের মুখ স্তন্যপানের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি

করেন, তেমনি তাহার পাকস্থলীও স্তন্য-পরিপাকের উপযুক্ত রাখেন, এবং তাহাদিগের শরীরে যে পরিমাণে যে পদার্থ থাকে, সেই পরিমিত সেই পদার্থ সংযোগে স্তন্য উৎপাদন করেন। পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বাস্থ্যসম্পন্ন স্ত্রীর স্তন্যে যে পদার্থ যে পরিমাণে থাকে, শিশুদিগের শরীরেও সেই পরিমাণে সেই পদার্থ থাকে। শিশুশরীরের যে অংশের পুষ্টিবর্দ্ধনার্থ স্তন্যের যে ভাগ আবশ্যক, তৎপীত স্তন্যের সেই ভাগ পাক-যন্ত্রাদি দ্বারা সেই অংশে নীত হইয়া তাহা পরিপোষিত হয়। এইরূপে, জগদী-শ্বর শিশুশরীর স্তন্যপোষ্য এবং স্তন্য শিশুদেহ-পোষণোপযুক্ত করিয়া অপার করুণা বিস্তার করিয়াছেন।

শিশুদিগের মাঢ়িমধ্যে নিবিষ্ট ২০টী দন্তের মধ্যে একটী দাঁত ছয় মাস হইতে ১০ মাস বয়সের মধ্যে প্রকাশিত হয়, এবং দুই বৎসরের মধ্যে সমুদায় ২০টী দন্ত প্রকাশ পায়। ঐ ২০টী দন্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, ছেদন দন্ত, শ্বদন্ত, ও পেষণদন্ত। সম্মুখস্থ উপরের চারিটী ও নিম্নের চারিটী দন্তের অগ্রভাগ বাটালির ধারের ন্যায়, তদ্দ্বারা খাদ্য দ্রব্য ছেদন করা যায়, এই নিমিত্ত, উহাদিগকে ছেদন-দন্ত কহে। ছেদন-দন্তের দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া নীচে উপরে ৪টী দন্তের অগ্রভাগ কুক্কুরদন্তের ন্যায় সূচাল

বলিয়া, উহারা শ্বদন্তনামে খ্যাত। শ্বদন্তের উভয় পার্শ্বে চারিটী করিয়া নীচে উপরে ৮টী দন্ত দেখা যায়। ঐ সকল দন্তের অগ্রভাগ বিস্তৃত ও বন্ধুর হওয়াতে খাদ্য দ্রব্য পেষণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত; এই প্রযুক্ত উহাদিগকে পেষণ দন্ত কহা গিয়া থাকে।

এক এক চোয়ালে ১৬টী করিয়া দাঁত থাকিতে পারে, সুতরাং শৈশবকালে প্রত্যেক চোয়ালের এক এক পার্শ্বে ৩টী করিয়া উভয় চোয়ালে ১২টী দন্তের স্থান শূন্য থাকে।

প্রথমতঃ মধ্যস্থ ছেদন-দন্তদ্বয় উঠে, তাহার পর যথাক্রমে পার্শ্বস্থ ছেদন-দন্ত, শ্বদন্ত ও পেষণদন্ত উদ্ভূত হয়। দুগ্ধোপজীবী শিশুদিগের ঐ সকল দন্ত উদ্গত হয় বলিয়া তাহাদিগকে সচরাচর দুধে-দাঁত কহে। ৫।৬ বৎসর বয়সে দুধে দাঁত পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে নূতন দন্ত উঠিতে থাকে। ঐ সকল নূতনোদ্গত দন্ত দীর্ঘকাল থাকে বলিয়া তাহাদিগকে স্থায়ী দন্ত কহা যায়।

প্রথম উদ্ভূত পেষণ দন্তগুলি পড়িয়া গেলে, সেই স্থানে ৮টী দ্ব্যগ্রদন্ত এবং প্রত্যেক চোয়ালে তাহার এক এক পার্শ্বে ৩টী করিয়া পেষণ-দন্ত উঠে। প্রথম উদ্গত পেষণ-দন্তের এক এক পার্শ্বে যে ৩টী করিয়া স্থান পূর্ব্বে দন্তশূন্য থাকে, তাহাদিগের মধ্যে ঐ দন্তের

অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী স্থাননিচয়ে স্থায়ী দন্তের প্রথম প্রকাশ হয়; এই হেতু তত্তৎস্থানীয় দন্ত স্থায়ীদন্তের প্রাথমিক দন্ত বলিয়া গণনীয়। প্রাথমিক স্থায়ী দন্তো-দ্গমনের পর আর ২টী করিয়া পেষণদন্ত যথাক্রমে উঠিয়া থাকে। এইরূপে ৬ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে সমুদায় দুধে দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়া স্থায়ী দাঁত উঠা সম্পন্ন হয়।

উপরের চোয়াল অচল। উহাতে যে সকল দন্ত আছে, তাহার ঠিক নিম্নে অধঃস্থ চোয়ালেও তদাকার-সম্পন্ন দন্ত নিবদ্ধ আছে। অতএব, মুখ বন্ধ করিলে উপরের চোয়ালের পেষণ দন্ত নিম্ন চোয়ালের পেষণ-দন্তের ঠিক উপরে পড়ে; কিন্তু নিম্নের ছেদন-দন্ত ও শ্বদন্ত উপরিস্থ ঐ ঐ দন্তের অগ্রভাগের পশ্চাতে প্রবেশ করে। তৎকালে উপরিস্থ ছেদন-দন্তের অন্তর্দ্দেশ অধঃস্থ ছেদন-দন্তের অগ্রভাগে সংলগ্ন হয়। দন্তের গঠনপ্রকারের এবং কার্য্যোপযোগিতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ হইবার তাৎ-পর্য্য-বোধ অনায়াসে হইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য ছেদন করা ছেদন-দন্তের কার্য্য এবং উহাকে চর্ব্বিত করা পেষণ-দন্তের প্রয়োজন। উপরিস্থ পেষণদন্ত নিম্নের পেষণ-দন্তের উপরে না থাকিলে পেষণক্রিয়া সম্পা-দিত হইতে পারে না বলিয়া উহারা ঐ রূপে অবস্থিত

হয়। কিন্তু খাদ্য দ্রব্য কর্ত্তন করিতে ছেদন-দন্তের ঐরূপ অবস্থান আবশ্যক হয় না; বিশেষতঃ তাহাদিগের অগ্রভাগ ধারালপ্রযুক্ত একটী অপরের উপরে তিষ্ঠিতে পারে না; সুতরাং নিম্নস্থ ছেদন-দন্তসকল উপরের ছেদন-দন্তের পশ্চাৎ প্রবেশ করে। কোন কোন ব্যক্তির মুখবন্ধের সময় অধঃস্থ চোয়ালের ছেদন দন্ত উপরিস্থ ছেদন-দন্তের বাহিরে থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা মুখের গঠনসৌষ্ঠবের বিকার মাত্র।

নিম্নের চোয়াল উপরিস্থ চোয়ালের সহিত এরূপে সংলগ্ন যে, যেমন কব্জাবদ্ধ কপাট এদিকে ওদিকে সঞ্চালিত হইতে পারে, নিম্ন চোয়ালও সেইরূপে নীচে উপরে চালিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, নিম্ন চোয়াল ঈষৎ পার্শ্বদিকে চালিত হয়, তাহাতেই দন্তমধ্যস্থ খাদ্যদ্রব্য জাঁতার মধ্যগত সামগ্রীর ন্যায় পিষ্ট হইয়াযায়।

পৃষ্ঠবংশ। পৃষ্ঠদেশের সর্ব্ব নিম্নস্থান হইতে গলদেশের সর্ব্বোচ্চ স্থান পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত অস্থিময় দীর্ঘ দণ্ডকে মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠবংশ কহে। পৃষ্ঠবংশ কতিপয় অঙ্গুরীয়াকার অস্থিখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ সকল অস্থিখণ্ড কশেরুকাশব্দে বাচ্য। কশেরুকা সকল উপর্য্যুপরি অবস্থাপিত আছে; এবং প্রত্যেক কশেরুকা অপর কশেরুকার সহিত যথায়

সংলগ্ন হইয়াছে, তাহার পশ্চাদ্দেশে তিনটী অস্থি প্রবর্দ্ধন আছে। ঐ প্রবর্দ্ধন ত্রয়ের দুই পার্শ্বের দুইটীকে অনুপ্রস্থ প্রবর্দ্ধন ও মধ্যোদ্গতটীকে কন্টক প্রবর্দ্ধন কহে। কন্টক প্রবর্দ্ধন নিম্ন দিকে কিঞ্চিৎ বক্র ভাবে অবস্থিত আছে। কশেরুকার অঙ্গুরীয়াকার গাত্রের ধারে অনুপ্রস্থ প্রবর্দ্ধনের নিকটে নিম্নতা আছে। কাশেরুকা সকল উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত হইলে তাহাদিগের ঐ নিম্ন মুখ পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায়, যে অবকাশ হয়, তাহাকে কশেরুকান্তর অবকাশ কহে। কশেরুকান্তর অবকাশ দিয়া কতিপয় কাশেরুক স্নায়ু নির্গত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

কশেরুকা সকল পরস্পর উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত থাকিলেও তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী গাত্র সকল পরস্পর সংলগ্ন নহে। উহাদ্বিগের মধ্যে এক প্রকার উপাস্থি-ময় পদার্থ আছে; ঐ উপাস্থিময় পদার্থ কশেরুকা-গাত্রে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। বিশেষতঃ উহার অত্যন্ত স্থিতিস্থাপকতা, অনপসার্য্যত্ব ও নমনীয়তা গুণ আছে; তাহাতেই তদ্দ্বারা সংযোজিত কশেরুকা সকল ঈষৎ মাত্র চালিত হইতে পারে: এবং মধ্যগত উপা-স্থির একদিক্ সঙ্কুচিত ও অপর ভাগ প্রসারিত হইয়া এক খণ্ড কশেরুকা আর এক খণ্ডাভিমুখে অবনত

হইতে পারে। উপাস্থি সকল কশেরুকা-গাত্রে এরূপ দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে কশেরুকাগুলি ঈষচ্চালিত, উন্নামিত বা অবনামিত হইলেও স্থানভ্রষ্ট হয় না। এইরূপে পৃষ্ঠবংশের আবশ্যক কাঠিন্য ও দৃঢ়তা রক্ষা পাইয়া উহার আবশ্যক স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা জন্মিয়াছে। পৃষ্ঠবংশ খণ্ড খণ্ড অস্থিমালা না হইয়া যদি একখণ্ড দীর্ঘ অস্থি হইত, তাহাহইলে আমাদিগকে স্তম্ভবৎ হইয়া থাকিতে হইত। আমরা না সম্মুখদিকে অবনত হইতে পারিতাম, না পশ্চাৎদিকে হেলিয়া বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম এবং না পৃষ্ঠদিকে বক্র হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারিতাম। দণ্ডবৎ ঊর্দ্ধাধোভাবে থাকিয়া আমাদিগের বহুকষ্টে জীবন অতিবাহন করিতে হইত। কিন্তু করুণাপুর্ণ পরমেশ্বর পৃষ্ঠবংশ অস্থিমালা গ্রথিত করিয়া ও বিশেষ কৌশলে তাহার সন্ধিস্থান রচনা করিয়া আমাদিগের সমুদায় কষ্টের পরিহার করিয়াছেন। আমরা যে ভাগে ইচ্ছা সেইভাগে বক্র হইয়া একভাবে অবস্থান-ক্লেশ শান্তি করিতে পারি।

পৃষ্ঠবংশের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় ভাগেই বন্ধনী-পরম্পরা দ্বারা কশেরুকা সকল দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ আছে। পৃষ্ঠবংশীয় সম্মুখভাগস্থ বন্ধনীকে অগ্র সামান্য বন্ধনী কহে। অগ্রসামান্য বন্ধনী প্রভাবে পৃষ্ঠবংশ পশ্চাৎ-

দিকে অতিরিক্ত বক্র হইতে পারে না। পৃষ্ঠবংশের নালীর ভিতর কশেরুকা সকলের গাত্রের পশ্চাৎভাগে সংলগ্ন বন্ধনীকে পশ্চাৎ সামান্য বন্ধনী কহে; উহাতে পৃষ্ঠবংশকে সম্মুখদিকে অতিরিক্ত বক্র হইতে দেয় না। এইরূপে পৃষ্ঠবংশীয় বন্ধনী বিধানে জগদীশ্বর আমাদিগের শরীরের সম্মুখে বা পৃষ্ঠদিকে অতিরিক্ত বক্রতা নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

পৃষ্ঠবংশের পশ্চাৎস্থিত প্রবর্দ্ধনের শেষ ভাগ বিবিধ পৃষ্ঠবংশীয় পেশীর নিবেশস্থল। ঐ সকল পেশীদ্বারা পৃষ্ঠবংশ মধ্যকায়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দিকে চালিত হইয়া থাকে। পৃষ্ঠবংশের সম্মুখেও কতকগুলি পেশী নিবদ্ধ আছে; তাহারা মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠদেশস্থ পেশীদিগের বিপরীতাচারী। পৃষ্ঠদেশস্থ পেশী শরীরকে পশ্চাৎভাগে ও সম্মুখস্থ পেশী সম্মুখদিকে অবনত করে এবং অনুপ্রস্থ প্রবর্দ্ধন যুক্ত পেশী শরীরকে পার্শ্বদিকে বক্র করিয়া থাকে।

শরীরের আকার বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে শরীরের ভার মধ্য মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে অবস্থিত। অতএব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে শরীর নিয়তই সম্মুখদিকে অবনামিত হইবার সম্ভাবনা। সম্মুখাবনমন মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগস্থিত পেশী নিচয়ের অনুকূল কার্য্য, এবং পশ্চাৎস্থিত পেশী

নিবহের প্রতিকূল কার্য্য, কেবল মাত্র পশ্চাৎস্থ পেশী-বল, সম্মুখস্থ পেশীবল ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবের তুল্য নহে; সুতরাং তন্নিবন্ধন শরীর সম্মুখদিকে সমধিক হেলিবার সম্ভাবনা। অতএব, সম্মুখভাগে ঐ হেলন-প্রবণতা নিবারণার্থে পৃষ্ঠবংশের পশ্চাতে অস্থি প্রবর্দ্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং উহার সম্মুখ-ভাগে তাহা নাই।

পৃষ্ঠবংশের আকার অবলোকন করিলে উহার স্থানে স্থানে বক্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বক্রতামধ্যে শরীরের পৃষ্ঠদেশে উহার পশ্চাৎ ন্যুব্জতা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। জগদীশ্বর কিছুই নিরর্থক করেন নাই; আমাদিগের বক্ষঃস্থলের গহ্বর, হৃদয়, আমাশয় ফুসফুস প্রভৃতির আশ্রয় স্থান; উহাদিগের উপযুক্ত অবস্থান স্থলের নিমিত্ত বক্ষঃস্থলের গহ্বর বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক; অতএব ঐ স্থলে পৃষ্ঠ-বংশের বিস্তৃত ন্যুব্জতা হইয়া বক্ষঃস্থলের গহ্বরের পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার মস্তক ও কায়ভার ধারণ করিতে সক্ষম হইবে, এই প্রযুক্ত গ্রীবা ও কটি-দেশে পৃষ্ঠবংশের সম্মুখন্যুব্জতা নিরীক্ষিত হয়। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি পৃষ্ঠবংশ নির্ম্মাণে কত কৌশলই বিস্তার করিয়াছেন!

পৃষ্ঠবংশের সর্ব্বোপরি মস্তক অবস্থিত। মস্তক

দুইটী কশেরুকা দ্বারা অবলম্বিত। প্রথমটী শিরোধি-কশেরুকা, দ্বিতীয়টী দন্তুল কশেরুকা। প্রথম কশে-রুকার উপর মস্তক আরোহিত বলিয়া উহা শিরোধি নামে এবং দ্বিতীয় কশেরুকায় দন্তাকার একটী প্রব-র্দ্ধন আছে বলিয়া উহা দন্তুল প্রবর্দ্ধন নামে আখ্যাত হইল। শিরোধি কশেরুকায় একটী বৃহৎ ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র মধ্যদিয়া গিয়া দন্তুল কশেরুকার দন্তবৎ প্রব-র্দ্ধন একটী বন্ধনীর দ্বারা করোটীর সহিত সম্বদ্ধ হই-য়াছে। ঐ প্রবর্দ্ধন শিরোধি কশেরুকার আল-স্বরূপ। ঐ আলের উপরি সংস্থিত হইয়া শিরোধি কশেরুকা মস্তকের সহিত ঘূর্ণিত হইতে পারে। ঐ ঘূর্ণন ক্রিয়ার নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। মস্তক স্কন্ধ-সীমা অতিক্রম করিয়া ঘূর্ণিত হইতে পারে না। মস্তকের ঘূর্ণন ক্রিয়া ও গ্রীবা কশেরুকার নমনীয়তা আমাদিগের বিবিধ উপকারের নিদান। উহাদ্বারা আমরা আব-শ্যকমত অধোমুখ, ঊর্দ্ধমুখ, ও পার্শ্বাভিমুখ হইতে পারি বলিয়া, কত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকি, এবং আমাদিগের কত কার্য্য সুচারু নির্ব্বাহিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বুক্কাস্থি। মেরুদণ্ড অপেক্ষা অল্পদীর্ঘ একখানি অস্থিদণ্ড বক্ষঃস্থলের মধ্যরেখায় ঊর্দ্ধাধোভাবে বিস্তৃত আছে; উহা বুক্কাস্থি শব্দে নির্দ্দিষ্ট। কতকগুলি অর্দ্ধ-

বৃত্তাকার অস্থি পার্শ্বাপার্শ্বিরূপে মেরুদণ্ড ও বুক্কাস্থির সহিত সংযুক্ত আছে; উহাদিগকে পর্শুকা কহে। পর্শুকাগুলি পরস্পর থাকে থাকে সাজান ও সমান্তরাল থাকায় মেরুদণ্ড ও বুক্কাস্থির সহিত তাহাদিগের সংযোগে যে আকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দেখিতে পঞ্জরের মত; এই নিমিত্ত, উহা পঞ্জর নামে অভিহিত। পঞ্জরের ব্যাস রেখা-বৃত্তের ব্যাসের ন্যায় সকল স্থানে সমান নহে। বুক্কাস্থি হইতে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত উহার ব্যাসের পরিমাণ যত, একপার্শ্ব অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা ন্যূন। ঐ পঞ্জরের মধ্যে হৃদয় ও ফুস্ফুস্ অবস্থিত।

পর্শুকার যে ভাগ বুক্কাস্থির সহিত সংযুক্ত তাহা উপাস্থিময়। পর্শুকা সমুদায় ২৪ খানি। তন্মধ্যে ৮খানিকে অপ-পর্শুকা ও ২খানিকে ভাসমান পর্শুকা কহে। উপর হইতে আরম্ভ করিয়া গণনা করিলে অষ্টম হইতে একাদশ সঙ্খ্যাক পর্য্যন্ত প্রত্যেক পার্শ্বে যে ৪খানি পর্শুকা দেখা যায় তাহাদিগকে অপ-পর্শুকা ও তদধঃস্থকে ভাসমান পর্শুকা কহে। এই সকল অস্থি নিচয়ে দৃঢ়রূপ বেষ্টিত স্থলে শ্বাসকার্য্যের ও রক্তসঞ্চারের যন্ত্র সুরক্ষিত আছে।

কর্ম্মকারের ভস্ত্রাবৎ পঞ্জরের সঙ্কোচন প্রসারণ হইয়া আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্যকরূপে

নির্ব্বাহিত হয়। পর্শুকার গোল ভাগের নিম্নদিক অবনত আছে। কিন্তু যখন আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করি, তখন ফুস্ফুস্ প্রসারিত, সুতরাং বক্ষঃস্থলের আয়তন বৃদ্ধির আবশ্যকতা হয়। অতএব, তৎকালে সমুদায় পর্শুকাগুলি, বিশেষতঃ অপপর্শুকাগুলি উন্নত হইয়া বক্ষঃস্থলের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আবার যখন প্রশ্বাস ত্যাগ করা যায়, তখন ফুস্-ফুস্ সঙ্কুচিত ও বক্ষঃস্থলের আয়তন হ্রস্ব হইবার প্রয়োজন হয়; এই জন্য পর্শুকা সকল অবনত হইয়া তৎপ্রয়োজন সাধন করে। এইরূপে প্রতিবার নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত পর্শুকা সমুদায় উন্নতানত হইয়া থাকে। বিশ্বকারুর এমনি অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশল যে, শরীর বিশেষে শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমিনিটে ৩০।৪০ বার করিয়া পর্শুকাচয়ের সঙ্কোচন প্রসারণ হয়, তথাচ তৎসমুদায় অবিকল থাকে।

বাহু। দুইখণ্ড অস্থি নির্ম্মিত যন্ত্র-বিশেষে বাহুমূল সম্বন্ধ। ঐ অস্থিদ্বয়ের একখানির নাম অংসফলকাস্থি এবং আর একখানির নাম কণ্ঠাস্থি। হস্ত চালনা কালে উভয় স্কন্ধের পশ্চাৎদিকে যে ত্রিকোণাকার অস্থিদ্বয় চালিত হইতে দেখা যায়, তাহারাই অংস-ফলকাস্থি; এবং কণ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া বাহুমূল পর্য্যন্ত যে নলবৎ অস্থিখণ্ডদ্বয় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত

দেখা যায়, তাহাদিগকে কণ্ঠাস্থি কহে। অংস-ফলকাস্থির যেস্থানে বাহুমূল নিবদ্ধ, তাহা একটী গহ্বর। ঐ গহ্বর মধ্যে বাহুমূল বন্ধনীদ্বারা সংযুক্ত আছে। বাহুমূলের সহিত অংসফলকাস্থির সন্ধিস্থলকে জত্রু কহে।

শারীর বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বাহুকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ, এবং কর। স্কন্ধহইতে কফোণি পর্য্যন্ত যে ভাগ তাহাকে প্রগণ্ড কহে; কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত প্রকোষ্ঠ এবং মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কর কহে।

প্রগণ্ড। প্রগণ্ডে একখানি মাত্র অস্থি আছে। উহাকে প্রগণ্ডাস্থি কহে। প্রগণ্ডাস্থি বাহুর অন্যান্য অস্থি অপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূল। উহার যে অন্তভাগ অংসফলকের গহ্বরে নিবদ্ধ, তাহা গোলাকার প্রগণ্ডাস্থির অতিঅল্প মাত্র অংসফলকাস্থির গহ্বরে প্রবিষ্ট আছে। বাহুর চতুর্দ্দিকে অনায়াস সঞ্চালন জন্য তাহার ঐরূপ সংস্থান আবশ্যক বলিয়া করুণাবান্ পরমেশ্বর উহাকে ঐরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। উহার অপেক্ষাকৃত অধিক ভাগ অংস-ফলকাস্থির গহ্বরে নিমজ্জিত থাকিলে আমরা এক্ষণকার মত হস্ত চালনা করিতে পারিতাম না।

প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠে পার্শ্বাপার্শি অবস্থিত দুইখানি দীর্ঘ অস্থি আছে; উহার একখানিকে প্রকো-

ষ্ঠাস্থি ও অন্যকে চক্রদণ্ডাস্থি কহে। ঐ অস্থিদ্বয় বন্ধনীবিশেষদ্বারা প্রগণ্ডাস্থির সহিত সংযুক্ত। ঐ সংযোগস্থলকে কফোণি কহে। চক্রদণ্ডাস্থি প্রকোষ্ঠাস্থির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে। চক্রদণ্ডাস্থির সহিত আমাদিগের করাস্থি সংযুক্ত, তাহাতেই আমরা করতলকে যেদিকে ইচ্ছা ফিরাইতে পারি।

মণিবন্ধ। মণিবন্ধে ৮ খানি অস্থি আছে। ঐ সকল অস্থি উপর্য্যুপরি দুই শ্রেণীতে অবস্থিত এবং বন্ধনী দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। উহাদিগের পরস্পর সংযোগে একটী হ্রস্ব নলাকার উৎপন্ন হইয়াছে। বাহুর উপরিভাগ হইতে যে সকল রক্তবহ নাড়ী ও স্নায়ু করে সমাগত হইয়াছে, তাহারা ঐ নলমধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। ঐ নল এরূপ দৃঢ় যে, সমধিক বাহুবলেও সঙ্কুচিত হয় না। অতএব স্নায়ু ও রক্তবহ নাড়ী সকল তন্মধ্য দিয়া গমন করাতে তাহাদিগের বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প হইয়াছে। মণিবন্ধস্থ অস্থি সকল ঈষচ্চল মাত্র, কিন্তু তাহাদিগের সংযোগে করের অসঙ্খ্য প্রকার চালনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

করভ। মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির মূল-দেশপর্য্যন্ত করভাগকে করভ কহে। করভে কতকগুলি পাতলা পাতলা দীর্ঘ অস্থি আছে। ঐ সকল অস্থি মণিবন্ধের অস্থির সহিত সংযুক্ত। করভাস্থির ৪খানি সমান্তরাল

ও পার্শ্বাপার্শ্বি অবস্থিত, এবং তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলির মূলদেশের সহিত বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত। ঐ সকল অস্থি তাদৃশ সচল নহে। করভাস্থির যেখানির সহিত অঙ্গুষ্ঠ যোজিত, তাহা অন্যান্য অপেক্ষা অনেকাংশে সচল এবং করতলের দিকে অধিক অবনত। ঐ অস্থির সহিত অঙ্গুষ্ঠ এরূপে যোজিত, যে উহাকে অন্যান্য অঙ্গুলির সম্মুখে আনিতে পারা যায়। আমরা কর দ্বারা যে অনায়াসে বস্তু সকল ধারণ করি, তাহা অঙ্গুষ্ঠের ঐ ধর্ম্ম মূলক। অঙ্গুষ্ঠ-যোজনায় এরূপ চমৎকার কৌশল না থাকিলে আমরা করদ্বারা যে সকল কার্য্য করি, তাহার কিছুই সুসম্পাদিত হইত না, এবং আমাদিগের কর থাকা না থাকা এক প্রকার তুল্য হইত।

যে সকল অস্থি-পরম্পরার যোগে বাহুদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদিগের দৈর্ঘ্যের পরস্পর ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়াযায়। প্রগণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সকল অস্থির আনুক্রমিক হ্রাস অবলোকিত হয়। প্রগণ্ডাস্থি হইতে প্রকোষ্ঠাস্থি, তদপেক্ষা করভাস্থি, তাহা হইতে অঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বাস্থি, তদপেক্ষা দ্বিতীয়-পর্ব্বাস্থি ও তাহা অপেক্ষা তৃতীয়-পর্ব্বাস্থির দৈর্ঘ্য অল্প। বাহুতে এরূপ অস্থি-সন্নিবেশের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সহজেই প্রতীয়মান হইতে

পারে। ঊর্দ্ধদেশস্থ বাহু-অস্থি অপেক্ষা অধঃস্থ অস্থি-দিগের আনুক্রমিক হ্রস্বতাজন্য বাহুর অধোদেশে ক্রমশই সন্ধিস্থলের বাহুল্য হইয়াছে, এবং ঐরূপ সন্ধি-বাহুল্য প্রযুক্তই আমরা কর দ্বারা অনায়াসে দ্রব্যাদি ধারণ করিতে পারি। কোন বস্তু ধরিতে হইলে প্রথমতঃ প্রগণ্ড তদভিমুখে কিঞ্চিৎ চালিত হয়; তৎপরে প্রকোষ্ঠ কফোণির নিকট বক্র হইয়া সেই বস্তুর অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হয়; অবশেষে কর ও অঙ্গুলি ক্রমশঃ অল্পস্থানব্যাপী বক্রতা দ্বারা তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে। ফলতঃ বাহুস্থ অস্থি-নিচয় এরূপে সন্নিবিষ্ট বলিয়াই আমরা আবশ্যক মত সকল বস্তু ধরিতে পারি। ঐ সকল অস্থি যদি ঐরূপ আনুক্রমিক হ্রস্ব না হইয়া সকলই সমদীর্ঘ হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের পরস্পর অবনতি-মুখে কখনই ইচ্ছানুরূপ সকল বস্তু ধরা যাইত না।

বস্তি। বস্তি মধ্যকায়ের মূলদেশ-স্বরূপ। বস্তির মধ্যভাগ গভীর, ঐ গভীরতা ঊর্দ্ধাভিমুখে অবস্থিত, এবং উহাতে মেরুদণ্ডের মূলদেশ সংস্থিত। বস্তি-দেশীয় যে দুইখণ্ড অস্থির সহিত উরুমূল সংযুক্ত, তাহাদিগকে শ্রোণিফলক কহে। শ্রোণিফলকের সহিত অংসফলকের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। অংসফলক দ্বয় যেমত কণ্ঠাস্থি দ্বয় দ্বারা পরস্পর

সংযুক্ত, শ্রোণিফলক-দ্বয়ও সেইরূপ একটী অস্থিময় খিলান দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত, ঐ অস্থিময় খিলানকে উপস্থাস্থি কহে। অংসফলকের ন্যায় শ্রোণিফলকে দুইটী গহ্বর আছে; কিন্তু অংসফলকস্থ গহ্বর অপেক্ষা এই গহ্বর দ্বয়ের গভীরতা অধিক। শ্রোণিফলকের গহ্বরদ্বয় ঠিক অধোমুখ নহে, উহাদিগের মুখ কিঞ্চিৎ তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত।

উরু। উরুতে একখণ্ড অস্থি আছে, উহাকে উর্ব্বস্থি কহে। দেহস্থ অন্যান্য সকল অস্থি অপেক্ষা উর্ব্বস্থি দীর্ঘ ও স্থূল। উহার ঊর্দ্ধ অন্তের উপরিভাগ গোল। ঐ গোলভাগ শ্রোণিফলকের গভীর গহ্বরে প্রবিষ্ট ও বন্ধনীদ্বারা দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ। জত্রুস্থলে অংসফলকের গহ্বর অপেক্ষা বঙ্ক্ষণস্থলে শ্রোণিফলকের গভীরতা অধিক হইবার তাৎপর্য্য এই, পাদদ্বয় হইতে বাহুদ্বয়ের বিস্তৃত চালনা আবশ্যক, সুতরাং অংসফলকের অগভীর গহ্বরে বাহুমূলের অতি অল্পমাত্র ভাগ নিবদ্ধ থাকিয়া উহা অনায়াসে চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হয়, কিন্তু উরুদ্বয় শরীরভার বহনের নিমিত্ত অবস্থাপিত, অতএব, কোন বাহ্য আঘাতে উহা স্থানভ্রষ্ট না হয়, এই জন্য শ্রোণিফলকের গভীর গহ্বরে উরু-মুণ্ডের অধিক পরিমিত ভাগ প্রবিষ্ট ও দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

জঙ্ঘা। জানু ও ঘুটিকার মধ্যস্থ স্থানকে জঙ্ঘা কহে। প্রকোষ্ঠের ন্যায় জঙ্ঘায় দুইখানি অস্থি আছে। ঐ দুইখণ্ড অস্থিকে জঙ্ঘাস্থি ও নলকাস্থি কহে। জঙ্ঘাস্থি স্থূল এবং দীর্ঘ। জঙ্ঘাস্থি অপেক্ষা নলকাস্থি হ্রস্ব সরু এবং দেখিতে নলাকার, এই জন্য উহা ঐ নামে অভিহিত। নলকাস্থির ঊর্দ্ধ অস্ত গোলাকার এবং জঙ্ঘাস্থিতে নিবদ্ধ। প্রকোষ্ঠের চক্রদণ্ডের সহিত নলকাস্থির কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু নলকাস্থি চক্রদণ্ডের ন্যায় অপর অস্থির চতুর্দ্দিকে ঘুরে না, এবং করাস্থির ন্যায় উহার সহিত পদাস্থির সংযোগ নাই। পদাস্থি সকল জঙ্ঘাস্থির সহিত সম্নিকৃষ্টরূপে নিবদ্ধ।

পদ। করের ন্যায় পদও তিন অংশে বিভক্ত—উপগুল্ফ, প্রপদ ও অঙ্গুলি। পদাস্থি সকল খিলানাকার, এবং ঐরূপ খিলানাকার হওয়াতেই জঙ্ঘা হইতে যে সকল রক্তবহ নাড়ী ও স্নায়ু পদে প্রবেশ করিয়াছে তৎসমুদায় নির্ব্বিঘ্নিত আছে, এবং শরীরের ভার বহনের ও গমনাগমনের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

পদের গঠনপ্রকার এবং জঙ্ঘার সহিত তাহার অবস্থান, শরীরভার বহন ও গমনাগমনের সম্যক্ উপযুক্ত। যখন আমরা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকি, তখন আমাদিগের পদ জঙ্ঘার সহিত সমকোণে অবস্থিতি করে। পার্ষ্ণি হইতে পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ

পর্য্যন্ত পদের যেরূপ দৈর্ঘ্য তাহাতে উভয় পদ শরীর-ভার ধারণের উপযুক্ত ভূমি * হইয়াছে। উভয় পদের পার্ষ্ণি ও অঙ্গুলির সীমা, দুটি রেখা দ্বারা যোজিত করিলে যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্র হয়, তাহাই শরীর ভার ধারণের প্রকৃত ভূমি। পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, বস্তুমাত্রেই এমত একটি স্থান আছে, যে স্থান অবলম্বন করিলে সেই বস্তুর সমুদায় ভাগ অবলম্বন-প্রাপ্ত ও স্থির হইয়া থাকে, সেই স্থান-কে ভারকেন্দ্র কহে। লোকে দণ্ডাদির ভারকেন্দ্র অঙ্গুলিদ্বারা অবলম্বন করিয়া সমুদায় দণ্ডকে অঙ্গুলির উপরিভাগে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রাখে। কোন বস্তুর ভারকেন্দ্র হইতে ভূতলে লম্বরেখা পাতিত করিলে, যদি ঐ রেখা ঐ বস্তুর ভূমির তলায় না পড়িয়া তাহার বাহিরে পড়ে, তাহা হইলে উহার ভারকেন্দ্র অবলম্বন-প্রাপ্ত না হওয়াতে উহা উল্টিয়া পড়ে। আমরা যখন দণ্ডায়মান থাকি, তখন আমাদিগের শরীরের ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা নিপাতিত করিলে তাহা শরীরের উল্লিখিত ভূমির মধ্যে পড়ে, তাহা-তেই আমাদিগের শরীর স্থিরভাবে উন্নত থাকে। কিন্তু গমনকালে আমাদিগের শরীরের ভারকেন্দ্র এক স্থানে থাকে না, কখন দক্ষিণ পদের কখন বাম পদের

* তলা; বস্তুর যেভাগের উপরি অপরাংশ অবলম্বিত থাকে।

ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত হয়। যখন যে পদে অবস্থিত হয়, তখন বঙ্ক্ষণ ও জানুর নমনীয়তা-গুণে সেই পদের উপর নির্ভর দেওয়াতেই শরীর স্থির থাকে। দৌড়িবার সময় অগ্রে শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সম্মুখে হেলাইতে হয়, তাহাতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে পদদ্বয় অগ্রসর করিয়া দিয়া ভার-মধ্যকে শরীরের ভূমিতে অবলম্বন দিতে হয়। অতএব, স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাদাস্থি-সন্ধি-সকল আমাদিগের শরীর-বহনের নিমিত্ত উপযুক্তরূপে রচিত হইয়াছে। ঐরূপ সন্ধি রচিত না থাকিলে আমাদিগের গমনক্রিয়া, লম্ফনক্রিয়া হইত, এবং আমরা প্রতি পদক্ষেপেই পতিত হইয়া যাইতাম।

পদাস্থি-সকল খিলানের আকারে নিবিষ্ট বলিয়া আমাদিগের পদতল সমতল নহে। গুল্‌ফ ও উপগুল্‌ফের অপরদিকে গভীরতা আছে। পদদ্বয় সমতল হইলে বন্ধুর ভূমির উপরি গতায়াত করিতে আমাদিগকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইত, অথচ এক্ষণে তদ্দ্বারা যেরূপ শরীর-ভার বাহিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা তাহার ভার বহনের অধিক শক্তি জন্মিত না।

বাহু ও পাদের গঠন-প্রকারের অনেক সৌসাদৃশ্য নিরীক্ষিত হয়। জত্রুর সহিত বঙ্ক্ষণের, কফোণির

সহিত জানুর, মণিবন্ধের সহিত গুল্‌ফের নির্ম্মাণ-সাদৃশ্য স্পষ্টই লক্ষিত হয়। কিন্তু উহাদিগের কার্য্য-কারিতার ভূয়িষ্ঠ ভিন্নতা দেখা যায়। আমরা ইচ্ছানুসারে সকল বস্তু ধারণ করিব, এই অভিপ্রায়ে বাহুসন্ধি সঙ্কল্পিত হইয়াছে, পাদাস্থির সন্ধি কেবল গমনক্রিয়ার উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

পেশী।

বন্ধনীদ্বারা যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ অস্থিপরম্পরা-দ্বারা সামান্যতঃ শরীরের আকার সংস্থান হয়; কিন্তু বাহ্য অবয়বের বিশেষ গঠন পেশী-নিবেশনে সমুদ্ভূত হয়।

বয়স, ব্যবসায় এবং স্ত্রীপুরুষ ভেদে যে অবয়ব ভেদ লক্ষিত হয়, পেশীর অবস্থা-ভেদই তাহার মূল কারণ। শিশু অপেক্ষা যুবার এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের শারীরিক শ্রমসাধ্য অনেক কর্ম্ম করিতে হয়; সেই সেই কর্ম্মে তাহাদিগের শরীরস্থ পেশী-নিচয়ের অপেক্ষাকৃত চালনা হয়; সুতরাং শিশু ও স্ত্রী অপেক্ষা যুবা ও পুরু-

ষের পেশী সবল ও উহাদিগের পরস্পরের তদ্গত অবয়ব বৈলক্ষণ্য হয়। সেই প্রকার, যাহারা কায়িক শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকিয়া কাল যাপন করে, তাহাদিগের অপেক্ষা, কৃষক প্রভৃতি শারীরিক শ্রমজীবী ব্যক্তিদিগের পেশী বলবান ও পুষ্ট এবং তন্নিবন্ধন ঐ উভয়-প্রকার লোকের আকার-গত অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। চালনার তারতম্যানুসারে এক ব্যক্তির শরীরের ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পেশী ভিন্নরূপ বলশালী ও পুষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মকারের পাদস্থ পেশী অপেক্ষা বাহুর পেশী অধিক বলিষ্ঠ; নর্ত্তকের পাদস্থ পেশী শরীরের অপরাপর ভাগের পেশী অপেক্ষা সবল।

চালনাদ্বারা পেশীবলবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত, শরীরস্থ পেশীবল বৃদ্ধি করিতে হইলে শরীর সঞ্চালন করিতে হয়। কিন্তু শরীরের চালনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয়, একেবারে অধিক চালনা বৃদ্ধি করিলে, বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহারা ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহারা ক্রমে ক্রমে শরীরের চালনা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মল্ল ও বাজিকরেরা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া শারীরিক পেশীবল বৃদ্ধি করে। মল্লক্রীড়াদি দ্বারা যদিও দেহবল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা নিতান্ত নিরাপদ নহে। বাজিকরেরা শারীরিক ভঙ্গিগত কতপ্রকার

কৌতুক দেখাইয়া থাকে। তাহারা কখন বিস্তৃত লম্ফ প্রদান করে, কখন ভূলগ্ন-মস্তক ও ঊর্দ্ধপদ হয়, কখন ভূলগ্ন মস্তক স্থির করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে শরীরের অপর ভাগ ঘূর্ণিত করে ও নৃত্য করিতে থাকে, কখন অধোমুখ হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া, কখন পদ ও মস্তক এক স্থানে করিয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে। এই-রূপ ক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগের পেশীবল বর্দ্ধিত হইলেও তহাতে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথের ব্যতিক্রমে পেশীর অনেক-রূপ চালনা হইয়া থাকে, সুতরাং তন্নিবন্ধন যে বিপদ্ ঘটিবে, তাহা অসম্ভব নহে। সর্ চারল্স্ বেল সাহেব লিখিয়াছেন, কোন মল্লের পেশীবল অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়া শরীর ফাটিয়া গিয়াছিল, এবং দুইটী বালকও, ক্রমিক অভ্যাসের নিয়ম অবহেলন করাতে, ঐ দশাপন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পেশীর সঙ্কোচ্যতা-গুণপ্রভাবে শরীরের চালনাক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সঙ্কোচ্যতাগুণ পেশীর স্বভাব সিদ্ধ, কেবল পেশীলগ্ন গতিজনক স্নায়ুদ্বারা ঐ গুণের কার্য্য হইয়া থাকে। কোন পেশীকে স্নায়ু হইতে পৃথক্ করিলেও যত দিবস উহা পোষণ বিরহিত না হয়, তত দিন সঙ্কুচিত হইতে পারে। যদি শরীরের কোন স্থানের পেশী দীর্ঘকাল স্নায়ু হইতে পৃথক্ রাখা যায়, তবে যত

দিবস উহাতে রক্ত সঞ্চার হয়, তত দিন উহার সঙ্কো-চ্যতাগুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন পেশী দীর্ঘকাল ঐরূপ স্নায়ু-সম্বন্ধ-বিহীন থাকিলে সঙ্কোচ্যতা-গুণ বিরহিত হয়। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পীড়িতাঙ্গের পেশী সঙ্কোচ্যতা-বিহীন হয়, কিন্তু ঐ সংকোচ্যতা বিহীনত্ব কেবল পেশীর নিশ্চলতা জন্য ঘটে। পক্ষাঘাত রোগীর পীড়িতাঙ্গ নিশ্চল হয়, ও তন্নিবন্ধন তাহাতে রক্ত সঞ্চার হয় না বলিয়াই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। কোন অঙ্গের ধমনী কাটিয়া দিলে, তত্রত্য পেশী আর সঙ্কুচিত হয় না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, ধামনিক রক্তের সংযোগ রোধ হইলেই পেশীর সঙ্কোচ্যতা-গুণের অভাব হইয়া থাকে। সঙ্কোচ্যতা-গুণ পেশীর স্বভাবসিদ্ধ, তাহার আরও এক প্রমাণ এই, মৃত্যুর পর পেশী সমুদায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মৃত শরীর জীবিত শরীর অপেক্ষা যে কঠিন হয়, তাহার কারণ এই।

পেশীর সঙ্কোচন-কালে উহার প্রত্যেক সূত্রের দৈর্ঘ্যের হ্রাস হইয়া পরিসর বৃদ্ধি হয়। অতএব কোন পেশী সঙ্কুচিত হইলে, উহার আকার পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র, উহার আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। দৈর্ঘ্য হ্রস্ব হইয়া উহার আয়তনের যে ন্যূনতা হয়,

পরিসর বৃদ্ধি হইয়া তাহা পোষাইয়া যায়। সঙ্কুচিত হইলে পেশীরা স্ফীত উন্নত ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া থাকে।

পেশীসঙ্কোচনে উত্তাপ উৎপত্তি হয়। বেকুরেল্ ও ব্রেস্ চেট্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, দ্বিমূল* পেশীর সবল সঙ্কোচনে এক ডিগ্রী তাপ জন্মে; এবং যদি ক্রমাগত ঐরূপ সঙ্কোচন হয়, তাহা হইলে দুই ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পেশী সঙ্কোচনে কি নিমিত্ত তাপ উৎপত্তি হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই।

পেশী সঙ্কোচনে শব্দের উৎপত্তি হয়। ডাক্তার উলাস্টন কহেন, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্ণমধ্যে প্রবেশিত করিয়া, যদি অঙ্গুষ্ঠ চালনা করা যায়, তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠের পেশী সঙ্কোচনে যে শব্দ জন্মে, তাহা হস্ত ও অঙ্গুলির সহযোগে শ্রুতিগোচর হয়।

পেশী-সঙ্কোচনের পর তাহার বিস্তারণ হইলেও ঐ বিস্তৃতাবস্থা উহার নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়াবস্থা নহে,

---

* যে পেশীর দুইটী মূল তাহাকে দ্বিমূল পেশী কহে। বাহুর যে পেশী অংসফলকের দুইটী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রগণ্ডের সম্মুখ দিয়া গিয়া প্রকোষ্ঠস্থ চক্রদণ্ডাস্থিতে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বিমূল পেশী।

কেবল বিপরীতাচারী পেশীর শক্তিদ্বারা সামান্য দৃষ্টিতে তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া বোধ হয়। শরীরের প্রায় সমুদায় ভাগেই বিপরীতাচারী পেশী নিবিষ্ট আছে। কোন পেশীদ্বারা হস্ত আকুঞ্চিত হয়, কোন পেশীদ্বারা বিস্তারিত হইয়া থাকে; যখন হস্ত নিশ্চল থাকে, তখন ঐ উভয় প্রকার পেশী তুল্য বলে কার্য্য করে, অর্থাৎ আকুঞ্চনী পেশীর আকুঞ্চন-চেষ্টা বিস্তারণী-পেশীর বিস্তারণ-প্রবৃত্তির দ্বারা নিবারিত হইয়া, হস্ত স্থির ভাবে থাকে। পক্ষাঘাত রোগে জিহ্বার এক ভাগের পেশী অকর্ম্মা হইয়া গেলে, অপর ভাগস্থ পেশী-বলে জিহ্বা অপর দিকে হেলিয়া যায়। মুখ-মণ্ডলের এক ভাগের পেশীও ঐরূপ হইলে, যে ভাগের পেশী সুস্থ থাকে, মুখ সেই দিকে বক্র হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, পেশীদিগের পরস্পর বিরুদ্ধক্রিয়া-দ্বারা শরীরের অঙ্গ-বিশেষের নিশ্চলতা জন্মে এবং চেষ্টা-বিশেষের দ্বারা উহাদিগের কোন পেশী সমধিকরূপে সঙ্কুচিত হইলেই তদঙ্গের চালনা হয়। পেশীর সঙ্কোচন-কার্য্যে যেরূপ চেষ্টা বিশেষের প্রয়োজন হয়, প্রসারণ-কার্য্যও সেইরূপ চেষ্টা বিশেষের অধীন। কিন্তু শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে অবস্থায় আমাদিগের শরীর নিষ্ক্রিয় থাকে, সেই অবস্থায় পেশীরা যে কার্য্য করে,

তাহা ইচ্ছাধীন নহে, গ্রন্থিময়* স্নায়ুর ন্যায় পেশীলগ্ন স্নায়ুর ইচ্ছানিরপেক্ষ চেষ্টাদ্বারা ঐ কার্য্য হইয়া থাকে। এতদনুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, স্নায়ুগণ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদাই পেশীদিগকে ক্রিয়াবান্ রাখে; কেবল ইচ্ছা দ্বারা সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গবিশেষের নিশ্চলভাবস্থায় পেশীর যে কার্য্য হয়, তাহা সর্ব্বাবস্থায় ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলা যায় না। যখন আমরা জাগরিত থাকি, তখন শরীরের সর্ব্বস্থানেই অসংখ্য ঐচ্ছিক পেশী ক্রিয়াবান থাকে। যখন আমরা দণ্ডায়মান হই, তখন পাদলগ্নপেশী ও যে সকল পেশী মেরুদণ্ড এবং মস্তক উন্নত রাখে, তাহারা বিস্তৃত থাকে; উপবেশন কালে যদি আমরা পৃষ্ঠভার অন্য কোন বস্তুর উপর রক্ষা না করি, তাহা হইলে কশেরুকাস্থ পেশী সমুদায় বিস্তৃত হইয়া পৃষ্ঠদেশকে ঊর্দ্ধভাবে রক্ষা করে; তৎকালে শরীর নিশ্চল থাকিলেও, পেশীর ঐ সকল বিস্তারণ কার্য্যে ইচ্ছার অপেক্ষা করে; যে হেতু, নিদ্রিত অবস্থায় সেইরূপ অবস্থানেচ্ছার অন্যথা হইলেই, সমুদায় সন্ধিস্থান

* আমাদিগের শরীরে দুই জাতীয় স্নায়ু আছে; তাহার এক জাতীয়কে গ্রন্থিময় স্নায়ু কহে। ঐ স্নায়ু ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া তল্লগ্ন পেশীদিগকে ক্রিয়াবিশিষ্ট করে। ঐ স্নায়ুর বিশেষ বৃত্তান্ত পরাধ্যায়ে লিখিত হইবে।

শিথিল হয়, মেরুদণ্ড নত হয় এবং চিবুক অনবলম্বিত হইয়া বক্ষের উপরি অবনত হইয়া পড়ে।

যেমন কোন অঙ্গ পরিচালন করিতে হইলে পেশীর সংকোচন হয়, সেইরূপ কোন অঙ্গ স্থিরভাবে রক্ষা করিতে হইলে পেশীর বিস্তারণ আবশ্যক করে। সংকোচন ও বিস্তারণ উভয়বিধ কার্য্যেই উহার পরিশ্রম হয়, অতএব নিদ্রিত অবস্থায় পেশীরা কার্য্য-নির্লেপ হইয়া শ্রান্তি পরিহার করিয়া থাকে।

নিদ্রিত অবস্থায় কেবল ঐচ্ছিক পেশীর কার্য্য বিরাম হয়, অনৈচ্ছিক পেশীরা, কি নিদ্রিত, কি জাগরিত, সকল অবস্থাতেই ক্রিয়াবান্ থাকে। ঐচ্ছিক পেশীর ন্যায় উহাদিগের কিছুকাল কার্য্য-বিরতি না থাকিলে, তাহারা নিয়ত পরিশ্রম দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অনন্ত কৌশল-কারী পরমেশ্বর, উহার কার্য্যকাল মধ্যেই অবসর কাল প্রদান করিয়া, সে আশঙ্কার পরিহার করিয়াছেন। শরীর-মধ্যে রক্ত সঞ্চার, নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ও পরিপাক কার্য্য অনৈচ্ছিক পেশীবলে নির্ব্বাহিত হয়। ঐ সকল কার্য্য আমাদের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত অতীব প্রয়োজনীয়। কি নিদ্রাকাল, কি জাগরাবস্থা, কোন সময়েই তাহাদিগের বিরতি হইলে, আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না। অতএব, করুণানিধান বিশ্বপাতা এমনি কৌশল

করিয়াছেন, যে ঐ সকল কার্য্য সকলকালেই হইয়া থাকে, অথচ তত্ তত্ কার্য্যকারী পেশীরা নিয়ত চালনায় নিস্তেজ হইয়া যায় না; অর্থাৎ তিনি অনৈচ্ছিক পেশীদিগের চালনা নিরন্তর করিয়া দেন নাই, তাহারা একবার চালিত হইয়া তাহার পরক্ষণ বিশ্রাম লাভ করে, তাহার পর আবার চালিত হয়। এইরূপে অহর্নিশি শরীরের রক্তসঞ্চার প্রভৃতি জীবনরক্ষার অত্যাবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়, এবং সেই সেই কর্ম্মকারী পেশীরা ক্রমিক চালনায় নিস্তেজ হয় না। আমাদিগের হৃদয়ের চালনা, অনৈচ্ছিক পেশী চালনার এক সম্যক্ উদাহরণ স্থল।

সচরাচর পেশীর সূত্র-সঙ্খ্যার ন্যূনাধিক্য অনুসারে পেশীবলের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন পেশীর প্রত্যেক্ সূত্রের উপরি পেশীবল নির্ভর করে। যে অঙ্গ যৎ-পরিমাণে চালিত হয়, তদ্রূপ্য পেশীতে তত্পরিমিত রক্ত সঞ্চার হইয়া তাহার প্রত্যেক্ সূত্র পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

ইচ্ছানুসারে পেশী চালনা যেমত চমত্কার-জনক, বোধ হয়, শারীরিক কার্য্যের মধ্যে আর কিছুই তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে অঙ্গ চালিত করিতে হইবে, মনোগত ইচ্ছা যেন সেই অঙ্গের পেশীর প্রত্যেক্ সূত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে চালনা করে, এবং

সেই সূত্রসংখ্যা অগণনীয় হইলেও তাহারা একমত হইয়া অভীষ্ট চালনা সম্পাদন করে। এই সকল কার্য্য এত অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়, যে তাহা ভাবনা করিয়া স্থির করা যায় না, এবং কখন কখন অঙ্গ বিশেষের চালনা আমাদিগের ইচ্ছাধীন হইতেছে, তাহাও বোধ হয় না। আমরা কার্য্য-বিশেষে লিপ্ত থাকিয়া ও তৎকার্য্যে একতান-চিত্ত হইয়া সেই সময়ে শরীরের কত অঙ্গের চালনা করি, অথচ তাহাতে আমাদিগের ইচ্ছা প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা অনুভবও হয় না। আমরা কথা কহি, লিখি, বা গমন করি, সকলি ঐচ্ছিক পেশীর সংকোচ্যতা গুণে সম্পন্ন হয়; কিন্তু সেই সেই কার্য্য এরূপে নির্ব্বাহিত হয়, যে তজ্জন্য আমরা মনোমধ্যে কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি, এমতও বোধ হয় না। আবার, শরীরের অঙ্গাদির চালনা এমত সুন্দর-রূপে নির্ব্বাহিত হয় যে, একবারও তাহার কোন-দিকে কিছু ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হস্ত চালনার চেষ্টায় পদ-চালনা হয় না, এবং মুখ-ব্যাদান ইচ্ছায় চক্ষু নিমীলিত হয় না। যে অঙ্গ যে পরিমাণ বল দিয়া চালনা করিতে অভিলাষ করি, সেই অঙ্গ সেই পরিমিত বলে চালিত হয়। কোন বস্তু বলপূর্ব্বক আকর্ষণ চেষ্টায় অল্পাকৃষ্ট হয় না; এবং কিছু কিছু মৃদুরূপে ধরিতে গেলে, সমধিক বলে আক্রান্ত হয় না। যে যে

অঙ্গ দুই বা ততোধিক পেশীদ্বারা চালিত হয়, তন্মধ্যে প্রত্যেক্ পেশী সংকুচিত হইয়া থাকে, এবং ঐ ঐ সংকোচনে সেই সেই অঙ্গের যে যে গতিশক্তি জন্মে, তাহারা গতির নিয়মানুসারিণী হইয়া থাকে *। ধন্য জগদীশ্বরের কৌশল! তিনি এক এক স্থানে যে কত কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াও স্থির করা যায় না!

শরীরস্থ সমুদায় পেশীর মূল ও নিবেশস্থল এক একটী নহে। এমত অনেক পেশী আছে, যাহাদিগের এক মূল ও দুই বা অধিক নিবেশস্থল, এবং এক বা অধিক মূল থাকিয়া একটী মাত্র নিবেশস্থল আছে; এই

---

* গতির নিয়ম এই প্রকার। কোন বস্তুর গতি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাহাতে বল প্রয়োগ প্রয়োজন করে। ঐ বল যে অভিমুখে দেওয়া যায়, ঐ বস্তুর সেই অভিমুখে গতি হইয়া থাকে। কখন কখন দুই বা ততোধিক বল মিলিত হইয়া একদিকে মাত্র গতি সম্পাদন করে। কোন বস্তুকে যদি একটী বলের দ্বারা উত্তরাভিমুখে চালাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই সময়ে সমান আর একটী বল পশ্চিমাভিমুখে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, ঐ বস্তু ঐ উভয় বলের শক্তিক্রমে ঐ উভয়ের কোন দিকে না গিয়া মধ্যবর্ত্তী বায়ু কোণে গমন করে। সেই প্রকার, একটী বলের দ্বারা কোন বস্তু পূর্ব্বাভিমুখে সরলভাবে চালিত হইলে, যদি তাহার পর আর একটী বল দ্বারা উহাকে দক্ষিণাভিমুখে আকর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ উহা বক্র হইয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া থাকে। এই রূপে নানাপ্রকারে গতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। পেশীর দ্বারা শরীর চালনায়ও ঐ সকল নিয়মে কার্য্য হইয়া থাকে।

হেতু পেশীসংখ্যা নির্দ্ধারণ-বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নহেন। কেহ কোন এক পেশীর অধিক নিবেশস্থল বা মূল দেখিয়া তাহাকে একাধিক বলিয়া ধরিয়াছেন, কেহ বা তাহাকে একটী মাত্র বলিয়া গণনা করিয়াছেন। সর চার্লস্ বেলের মতানুসারে পেশীসংখ্যা ৪৩৬।

শরীরের বাম ও দক্ষিণ অঙ্গস্থ অস্থিনিচয় যেমন পরস্পর সদৃশ, ঐ ঐ অঙ্গের পেশীনিচয়ও সেইরূপ পরস্পর সদৃশ, এবং সমান স্থানে সমান কার্য্যের নিমিত্ত অবস্থাপিত; অতএব প্রায় সমুদায় পেশীকেই যুগ্ম যুগ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে যে পেশী যুগ্ম নহে তাহারা এরূপে সংস্থিত যে, শরীরের বাম ও দক্ষিণ অঙ্গে অর্দ্ধার্দ্ধ হইয়া আছে। আকার নিবেশস্থল ও কার্য্যানুসারে পেশীদিগের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—ত্রিকোণ-পেশী, বিষম চতুর্ভুজপেশী, জিহ্বীয় পেশী, পৃষ্ঠদেশীয় পেশী, চক্ষুপুটনিমীলক পেশী, অধরাবনামক পেশী ইত্যাদি।

পেশীসঙ্খ্যা ও তাহাদিগের আকার, তদধিকৃত স্থানের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, শরীরের পেশীসন্নিবেশ চমৎকারজনক বোধ হয়। শরীরে এত পেশী আছে যে, শরীর আচ্ছাদন করিতে হইলে তাহার অল্পসঙ্খ্যাক মাত্র প্রয়োজন হয়। কিন্তু জগদীশ্বর, কার্য্যানুসারে শরীরের স্থানবিশেষে তাহা-

দিগকে স্তরে স্তরে নিবেশিত করিয়া সমুদায় গুলিকেই স্থান দান করিয়াছেন। শরীরের যে ভাগে যত সঞ্চালনী ক্রিয়ার বাহুল্য ও স্থানের অল্পতা আছে, তথায় ঐ স্তরসঙ্খ্যার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক হইতে দুই অবধি পেশীস্তর আছে। আবার, যে অঙ্গ অধিক বলে চালনা করা আবশ্যক, তত্রত্য পেশীদিগের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ অধিক হওয়া প্রয়োজনীয়, সুতরাং তথায় তাহাদিগের নিবেশস্থলের আধিক্য থাকাও চাহি। পরমেশ্বরও সেইরূপ বিধান করিয়াছেন। শরীরের মধ্যকায় ঐরূপ পেশীনিবেশের দৃষ্টান্তস্থল।

পেশীদ্বারা কেবল অস্থিসকল চালিত হয়, এমত নহে; শরীরের অপেক্ষাকৃত কোমলাংশও উহার দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের অস্থিমধ্যে কেবল অধঃস্থ চোয়ালের অস্থি চালিত হয়, এবং ঐ অস্থি ভিন্ন মুখমণ্ডলস্থ পেশী সমূহ দ্বারা অপরাপর কোমল অংশগুলি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শরীরের কোমল অংশগুলিতে প্রধানতঃ অনৈচ্ছিক পেশীসকল নিবিষ্ট আছে।

একখানি পেশী নিয়ত চালিত হইয়া তাহা ক্রমে ক্রমে বলহীন ও অকর্ম্মা হইয়া না যায়, এই নিমিত্ত, প্রায় সকল স্থানেই এক কার্য্যের নিমিত্ত একাধিক পেশী নিবিষ্ট আছে, উহাদিগকে একযোগী পেশী কহে।

তাহাদিগের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের সহায়তা হইয়া অতিরিক্ত চালনা জন্য কোন পেশী বলহীন হইয়া যায় না।

মস্তক-পেশী—বিশ্বনিয়ন্তার এমনই শারীরবিধান-প্রণালী যে, আমাদিগের যে অঙ্গ যত সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহাতেই সঞ্চালন-ক্রিয়ার বাহুল্য হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মুখমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্নরূপ সঞ্চালন-ক্রিয়া লক্ষিত হয়, এবং তত্রত্য অংশসকল চালনা করাও সহজ। আমাদিগের মনোমধ্যে হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অসন্তোষ, যে কোন ভাবের উদয় হউক, করোটী, কপাল, চক্ষু, ভ্রূ, নাসা, গণ্ড, চিবুক, ওষ্ঠ, অধর ও জিহ্বার ভাবান্তর দ্বারা ঐ ঐ ভাব মুখশ্রীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মুখে ঐ ঐ ভাব প্রকাশের ভিন্নতা দেখা যায়। মুখমণ্ডলে ঐ ঐ ভাব প্রকাশ তাহার সঞ্চালন-বিশেষের উপর নির্ভর করে, এবং সেই সঞ্চালন-ক্রিয়া তত্রত্য পেশী-নিবহের দ্বারা হইয়া থাকে; অতএব, তাদৃশ জটিল কার্য্য সম্পাদন-জন্য পেশীসঙ্খ্যার আধিক্য হওয়া আবশ্যক বলিয়া তত্তৎ কার্য্য সাধনের জন্য মস্তক, মুখ ও গলদেশে সপ্ততি যুগল পেশী নিবেশিত হইয়াছে।

মস্তকস্থ পেশী-সমূহের মধ্যে ৫টী বা ৬টী পেশান্তর দ্বারা ভ্রূদেশ হইতে অবটু পর্য্যন্ত মস্তকের উপরি

ভাগ আচ্ছাদিত। ঐ পেশীস্তর দ্বারা মস্তকের ত্বক্, কেশ, কর্ণ এবং কপালের চর্ম্ম সঞ্চালিত হয়। মনোমধ্যে ক্রোধাদির উদ্দীপ্তি হইলে যে কপালচর্ম্ম কুঞ্চিত ও ভ্রূদ্বয় পরস্পরাভিমুখী হয়, তাহা ঐ পেশীসঙ্কোচনে হইয়া থাকে। আনন্দ বিস্ময় প্রভৃতি রসের উদ্রেক হইলে ভ্রূদ্বয় উন্নত হয়। চক্ষু এবং চক্ষুর পাতা দ্বাদশ যুগল পেশী দ্বারা চালিত হয়। চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন, ইতস্ততঃ সঞ্চালন, অশ্রুপতন ও তাহার নিবারণ সমুদায়ই ঐ দ্বাদশ যুগল পেশীদ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, এবং উপরের লিখিত মস্তকের পেশীনিচয়ের সংযোগে ইহাদিগের দ্বারা মনোগত ক্রোধ, প্রণয়, বিষাদ, আহ্লাদ প্রভৃতি মুখশ্রীতে অবভাসিত হয়।

নাসা ষট্‌যুগল পেশীদ্বারা এবং ওষ্ঠ, অধর, চিবুক, গণ্ড ও অধঃস্থ চোয়াল পঞ্চদশ পেশীযুগল দ্বারা সঞ্চালিত হয়। হাস্যকালে গণ্ড, ওষ্ঠ, অধর, চিবুক ও নাসা প্রভৃতির পেশী আকুঞ্চিত হইয়া থাকে।

গলদেশের এবং মস্তকের সঞ্চালন কার্য্য চত্বারিংশৎ পেশী-যুগল দ্বারা সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে অষ্টযুগলের দ্বারা মস্তকের সম্মুখাবনমন, সপ্তযুগল দ্বারা পশ্চাৎ হেলন ও সপ্তযুগল দ্বারা পার্শ্বাবনতি সম্পন্ন হয়।

মধ্যকায়-পেশী—মধ্যকায়ে এক শত যুগল পেশী

নিবিষ্ট আছে। মধ্যকায়ের পৃষ্ঠদেশে পেশীসঙ্খ্যা অধিক ও সম্মুখে অল্প। শরীরের ভারকেন্দ্র পৃষ্ঠবংশের সম্মুখ দিকে অবস্থিত, তন্নিবন্ধন শরীরের সম্মুখ দিকে অতিরিক্ত হেলনপ্রবণতা নিবারণার্থে পশ্চাতে পেশীসঙ্খ্যার আধিক্য হইয়াছে। একযোগী পেশীর উপকারিতা মেরুদণ্ডে বিশেষ লক্ষিত হয়। আমরা বসিয়া থাকি বা দণ্ডায়মান হই, চলিয়া যাই বা স্থির থাকি, যে সকল পেশী দ্বারা মেরুদণ্ড উন্নত থাকে, তাহারা নিয়তই চালিত হয়। নিয়ত চালনা-শ্রমে নিস্তেজ হইয়া না যায়, এই নিমিত্ত, জগদীশ্বর মেরুদণ্ডে একযোগী পেশী নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করাতে কেহই অতিশ্রমে ক্লান্ত হয় না।

বাহুপেশী—যে সকল পেশীদ্বারা বাহুদ্বয় চালিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বলবিশিষ্ট। ঐ সকল পেশীর মূল-দেশ বক্ষঃস্থলে এবং নিবেশস্থল প্রগণ্ডে, আছে। তদ্ভিন্ন বাহু পরিচালন জন্য আর একখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় পেশী স্কন্ধদেশে স্থাপিত আছে, উহাকে ত্রিকোণ-পেশী কহে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক পেশী দ্বারা প্রগণ্ড স্কন্ধের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, উহাদিগের দ্বারা বাহুদ্বয় স্কন্ধদেশে সংলগ্ন থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে পরিচালিত হয়।

বাহুপেশীর কতকগুলি স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রগণ্ডের উপর দিয়া গিয়া কফোণির নিম্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ঐ সকল পেশীর দ্বারা হস্তের উত্তোলন ও প্রসারণ কার্য্য হইয়া থাকে। যে সকল পেশীর দ্বারা হস্ত উত্তোলিত হয়, তাহাদিগকে হস্তাকুঞ্চনী ও যাহাদিগের দ্বারা প্রসারিত হয়, তাহাদিগকে হস্ত-বিস্তারণী পেশী কহে। হস্তাকুঞ্চনী পেশী বাহুর সম্মুখ ভাগে ও বিস্তারণী পেশী তাহার পশ্চাদ্দেশে নিবিষ্ট আছে। বিস্তারণী পেশী অপেক্ষা আকুঞ্চনী পেশীর সঙ্খ্যা অধিক ও আকৃতি স্থূল, এ নিমিত্ত, বাহুর সম্মুখ ভাগ যত উন্নত দেখা যায় পশ্চাদ্ভাগ তত উন্নত নহে। বাহুপেশীর এইরূপ হইবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। যখন আমরা হস্তদ্বারা কোন ভার উঠাই তখন প্রকোষ্ঠ স্কন্ধের দিকে ফিরাইতে হয়; এই কার্য্য আকুঞ্চনী পেশীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। যখন আমাদিগকে কোন ভার উত্তোলন করিতে হয় না, তখনও হস্ত উঠাইতে হইলে, হস্তভার উত্তোলন করিতে হয়। কিন্তু বাহু প্রসারণ কালে কোন ভার উঠাইতে হয় না, অথবা কোন বিরুদ্ধ বল নিবারণ করিতে হয় না, বরং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রসারণ-কার্য্যের আনুকূল্য করে, এই হেতু, অপেক্ষাকৃত সবল ও স্থূল আকুঞ্চনী পেশী বাহুর সম্মুখ ভাগে নিবিষ্ট

এবং তদপেক্ষা ক্ষীণবল ও অস্থূল বিস্তারণী পেশী বাহুর পশ্চাতে স্থাপিত হইয়াছে।

যদি কোন নিশ্চল বস্তু করদ্বারা বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া প্রকোষ্ঠ স্থির রাখা যায়, তাহা হইলে বাহুর আকুঞ্চনী পেশীর মূল ও নিবেশ-স্থলের কার্য্য-ব্যতিক্রম হইয়া তদ্দ্বারা প্রগণ্ড, স্কন্ধ এবং মধ্যকায় প্রকোষ্ঠাভিমুখে আকৃষ্ট হয়। কোন বৃক্ষশাখা ধরিয়া ঝুলিলে ঐরূপ হওয়া অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তৎকালে প্রগণ্ড ও প্রকোষ্ঠ উভয়ই নিশ্চল রাখা যায়, তাহা হইলে স্কন্ধদেশ ও তল্লগ্ন অংশাদি বাহু অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রকোষ্ঠ ১৯খানি পেশীর দ্বারা পরিবৃত। তন্মধ্যে ১৩ খানির এক দিকের শেষ ভাগ রজ্জুবৎ হইয়া প্রগণ্ডের অধোভাগের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে এবং ৬খানি ঐরূপে প্রকোষ্ঠের উপরি ভাগে সংলগ্ন আছে। ঐ সকল পেশী ক্রমশঃ রজ্জুবৎ হইয়া মণিবন্ধের উপরি দিয়া গমন করিয়া কর ও অঙ্গুলিতে বিস্তৃত হইয়া আছে। ঐ সকল পেশী দ্বারা কর ও অঙ্গুলি সকল নানাপ্রকার চালিত হয়। বাহুর নিম্নভাগ, মণিবন্ধ ও করের আকার ও কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যদি কোনরূপ প্রতিবিধানের উপায় করা না থাকে, তাহা হইলে করকে বাহু অভি-

মুখে ফিরাইবার সময় মণিবন্ধলগ্ন পেশী তাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব, ঐ বিশ্লেষ নিবারণ জন্য দুইটী অঙ্গুরীয়াকার বন্ধনীদ্বারা মণিবন্ধের পেশী সকল তাহাতে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ আছে। কেবল মণিবন্ধেই পেশীরা ঐরূপ বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধ এমত নহে, মণিবন্ধ ও কফোণির ন্যায় যে যে স্থল নানাদিকে চালিত হয় সেই সেই স্থলের পেশী ঐপ্রকার বন্ধনী দ্বারা সম্বদ্ধ আছে।

করপেশী—উপরের লিখিত বাহুপেশী দ্বারা করসঞ্চালন ভিন্ন আরও কতকগুলি পেশীদ্বারা কর চালনা সম্পন্ন হয়। ঐ সকল পেশী করতলে স্থাপিত আছে। তাহাদিগের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গুলির সঞ্চালনক্রিয়া বিশেষরূপে সাধিত হয়। ঐ সকল পেশীর চারিখানি অঙ্গুষ্ঠ ও চারিখানি কনিষ্ঠা অঙ্গুলি চালনা করে। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে ও, কনিষ্ঠার মূল হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত করতলের অপর ভাগ অপেক্ষা যে উন্নতাকার দেখা যায়, ঐ কয়েকখানি পেশী নিবেশনই তাহার কারণ। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গুলির সঞ্চালন কার্য্য অধিকতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত বাহুপেশীদ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ঐ সকল বাহুপেশী রজ্জুবৎ হইয়া অঙ্গুলির সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। করপেশী সকল যথাস্থানে বন্ধনীদ্বারা নিবদ্ধ আছে।

উল্লিখিত পেশীভিন্ন করভাস্থি-গুলির মধ্যদেশে আরও কতকগুলি পেশী আছে। ঐ সকল পেশী দ্বারা অঙ্গুলি সকল পরস্পর দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী করা গিয়াথাকে। তদ্‌ভিন্ন উহাদিগের দ্বারা করতলাভিমুখে অঙ্গুলির অবনামন কার্য্যেও কিছু সহায়তা হয়।

পাদপেশী—ঊর্দ্ধাস্থি ১৬ খানি পেশী দ্বারা মধ্যকায়ের সহিত সম্বদ্ধ। ঊর্দ্ধাস্থির চালনা ক্রিয়ার বাহুল্য প্রযুক্ত উহা অত পেশী দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্ক্ষণসন্ধির কিঞ্চিৎ নিম্নে প্রায় ঐ সকল পেশীর নিবেশস্থল। উহাদিগের মূল প্রায়ই বস্তিদেশে নিবদ্ধ, কেবল কয়েক খানির মূল কশেরুকায় আবদ্ধ আছে। যে সকল পেশীদ্বারা ঊর্দ্ধাস্থি পরিবৃত তাহাদিগের মধ্যে কয়েক খানির নিবেশস্থল জানুর নিম্নে জঙ্ঘার অস্থিদ্বয়ে আছে। ঐ সকল পেশীর যেগুলি দ্বারা জঙ্ঘা ঊরুর অভিমুখে আকৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে আকুঞ্চনী ও যেগুলি দ্বারা তাহার বিপরীত ক্রিয়া হয় তাহাদিগকে বিস্তারণী কহে।

জঙ্ঘার অস্থিদ্বয় ১৬ খানি পেশীদ্বারা আবৃত। জঙ্ঘার পেশীগুলি ক্রমশঃ রজ্জুবৎ হইয়া পদ ও পদাঙ্গুলিতে গমন করিয়াছে। প্রকোষ্ঠের পেশী যেরূপ মণিবন্ধ দিয়া গমন করিয়াছে ও তথায় বন্ধনীবিশেষ দ্বারা আবদ্ধ আছে, জঙ্ঘার পেশীও সেইরূপ গুল্‌ফে

নিবদ্ধ আছে। ফলতঃ করপেশীর সহিত পদপেশীর সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য আছে। যে সকল পেশীদ্বারা পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি চালিত হয়, তাহারা করের ঐ ঐ অঙ্গুলিচালক পেশীর ন্যায় পদের তাদৃশ স্থানে নিবেশিত আছে। অন্যান্য অঙ্গুলিগুলি জঙ্ঘাগত পেশীদ্বারা চালিত হয়, ঐ সকল পেশী পদের মধ্য-ভাগে সংস্থিত। করপেশী দ্বারা যেমন করাঙ্গুলির সঞ্চালনক্রিয়া সাধিত হয়, পদস্থ পেশীর দ্বারাও পদাঙ্গুলির সেইরূপ চালনা হয়।

বাহুতে পেশীদিগকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রাখিবার জন্য যেমন বন্ধনী আছে, পাদ-পেশীও সেইরূপ বন্ধনী দ্বারা স্ব স্ব স্থানে নিবদ্ধ আছে। ঐ সকল বন্ধনীর অন্তর্দ্দেশে একপ্রকার স্নৈহিক পদার্থ নিয়ত প্রবাহিত হইয়া তন্নিম্নস্থ পেশী-দিগের অনায়াসে সঞ্চালন সমাধা করে।

সামান্যতঃ পেশী-দিগকে দুই শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে, ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এমত অনেক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যাহা ইচ্ছাধীন এবং ইচ্ছার অভাবেও সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্বাস-কার্য্য, রোদন, দীর্ঘশ্বাস, জৃম্ভণ প্রভৃতি ইচ্ছানুসারে ঘটিতে পারে, সুতরাং তৎতৎ কার্য্যকারী পেশী-দিগকে ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক

ইহার কোন শ্রেণীতেই প্রকৃত রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। অতএব পেশী-দিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত। প্রথমতঃ যাহাদিগের সঞ্চালন ক্রিয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; হস্তপদাদির পেশী ঐ শ্রেণী-নিবিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ যাহাদিগের সঞ্চালন ক্রিয়া ইচ্ছানিরপেক্ষ হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে ইচ্ছা দ্বারা হইতে পারে; এই শ্রেণীর পেশী দ্বারা শ্বাস কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়। তৃতীয়তঃ যাহা-দিগের সঞ্চালন ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হইয়া থাকে; রক্ত-সঞ্চার ও পাককার্য্য এই শ্রেণীস্থ পেশী দ্বারা সাধিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্নায়ু।

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক সমুদায় কর্ম্ম স্নায়ুর অধীন। আমরা যে কোন কার্য্য করি, বা যে কোন বিষয়ের চিন্তা করি, স্নায়ুই তাহার মূল। স্নায়ু শরীরের সহিত মনের সংযোগ-পথ। আমাদিগের শরীরের যখন যে অবস্থা হয়, স্নায়ু দ্বারা তাহা মনো-

মধ্যে সম্বেদিত হয়, এবং মনোগত ভাব বাহ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উহা দ্বারা সমুদায় বাহ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মে, এবং সেই লব্ধ জ্ঞান সঞ্চিত ও কার্য্যে প্রয়োজিত হয়। যে বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য ভূলোকের অধিপতি হইয়াছেন, স্নায়ুই তাহার নিদান।

শরীরে দুইরূপ স্নায়ু আছে। ঐ দুইপ্রকার স্নায়ু পরস্পর সর্ব্বতঃ স্বতন্ত্র না হইলেও উহাদিগের কার্য্য-গত এত বৈলক্ষণ্য আছে, যে তন্নিবন্ধন তাহাদিগের দুইটী নাম দেওয়া গিয়াছে। একপ্রকার স্নায়ুর নাম মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয়-স্নায়ু; অন্যের নাম গ্রন্থিময় স্নায়ু।

মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয়-স্নায়ু—এই স্নায়ুর মূল ভাগ করোটী ও মেরুদণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট। উহার যে ভাগ করোটীর মধ্যগত, তাহা মস্তিষ্ক, এবং যে ভাগ পৃষ্ঠ-বংশের অন্তর্গত, তাহা মেরু-দণ্ডগতমজ্জা নামে আখ্যাত। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডগত-মজ্জা কোমল এবং উহার কোন স্থল ধূসর বর্ণ ও কোন স্থল শ্বেত-বর্ণ নিরীক্ষিত হয়। ইহারা অস্থিময় কোষে সংর-ক্ষিত হইলেও ত্রিবিধ আবরণে আবৃত আছে। ইহা-দিগের দ্বারা শরীরের গতিজনন ও বাহ্য পদার্থের জ্ঞান-জনন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহাদিগের কার্য্য লিখিবার পূর্ব্বে এতদুদ্গত স্নায়ুর বিবরণ লিখিত হইতেছে।

স্নায়ু কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রসংহতি। ঐ সকল সূত্রদ্বারা সমানরূপ কার্য্য হয় না। কোন সূত্রের দ্বারা গতি জন্মে ও কোন সূত্রের দ্বারা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যে সূত্র দ্বারা জ্ঞান জন্মে, তাহা দ্বারা গতি জন্মে না। এবং যদ্দ্বারা গতি জন্মে তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। সকল সূত্রও সমানাকার নহে। ডাক্তার মাণ্ডলের মতানুসারে গতিজনক স্নায়ুসূত্র অপেক্ষা জ্ঞানজনক স্নায়ুসূত্র পুরু। স্নায়ুসূত্রের মধ্যে একপ্রকার তরল পদার্থ আছে; পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ঐ তরল-পদার্থের সংযোগে স্নায়ুর কার্য্য হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডগত-মজ্জা হইতে ত্রিচত্বারিংশৎ যুগল স্নায়ু নির্গত হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বাদশ যুগল মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়া করোটীর অস্থিরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়াছে, উহাদিগকে করোটীয় স্নায়ু কহে। ঐ সকল স্নায়ুদ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়; মুখমণ্ডলের অন্যান্য ভাগ, ফুস্ফুস এবং আমাশয়ের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

একবিংশতি যুগল স্নায়ু, মেরুদণ্ডগত-মজ্জা হইতে পৃষ্ঠবংশের কশেরুকান্তর্গত ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়াছে। এই সকল স্নায়ুর দুইটী মূল আছে—একটীকে পুরোমূল, অপরটীকে পশ্চাৎমূল কহে। ঐ দুইটী মূল মজ্জার নিকটেই মিলিত হইয়া একাকার ধারণ

করিয়াছে। পশ্চাৎমূল-বিনির্গত স্নায়ুসূত্রের দ্বারা জ্ঞান জন্মে ও পুরোমূলোদ্ভূত স্নায়ু দ্বারা গতিক্রিয়া সাধিত হয়।

স্নায়ু সকল অসঙ্খ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল শাখা প্রশাখা স্থান-বিশেষে এত সূক্ষ্ম যে, কোন ক্রমে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যেক স্নায়ুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। তাহারা অসঙ্খ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হউক, অথবা সেই সকল শাখা প্রশাখা ক্রমশঃ মিলিত হইয়া মূল-দেশের নিকট স্থূলতা অবলম্বন করুক, তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহ নাড়ী-সকল যেমন পরস্পর মিলিত অর্থাৎ একটীর রক্তপ্রবাহ অন্যটীর রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত স্থূলতর একটী নাড়ীতে পরিণত হয়, ইহাদিগের মিলন সেরূপ নহে। ইহারা পরস্পর কেবল নিকটবর্ত্তী হয় মাত্র; ইহাদিগের প্রত্যেক সূত্র পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ থাকে।

প্রত্যেক্ স্নায়ু একপ্রকার সূত্রময় আবরণে আবৃত আছে, উহাকে স্নায়ুকোষ কহে। এক এক স্নায়ুকোষে গতিজনক ও জ্ঞানজনক উভয় প্রকার স্নায়ুসূত্র থাকে। ঐ স্নায়ুসূত্র সকলও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবরণে

পরিবৃত থাকে। জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য কৌশল, যেটী যে কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইটী দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারে না। গতি জননের চেষ্টায় জ্ঞানজনক স্নায়ুসূত্র অথবা জ্ঞানজনন চেষ্টায় গতি-জনক সূত্র উত্তেজিত হয় না।

পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, যেমন তাড়িত বার্ত্তা-বহ যন্ত্রে তারসংযোগে এক স্থানের সংবাদ অন্যত্র বাহিত হয়, স্নায়ু সহযোগেও সেইরূপে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান মনোমধ্যে নীত হয়, ও মনোগত চেষ্টা অঙ্গ-বিশেষে ব্যাপ্ত হইয়া সেই অঙ্গ পরিচালনা করে, এবং যেমন কতিপয় তারমধ্যে রেশম প্রভৃতি কোন অপরিচালক পদার্থ দিলে, একটা তারের তাড়িত-প্রবাহ অপর তারে সংক্রমিত হইতে পারে না, স্নায়ু সূত্র গুলিও পৃথক পৃথক আবরণে আবৃত থাকাতে, এক সূত্রের কার্য্যচেষ্টা অন্য সূত্রে ব্যাপ্ত হয় না।

কত অল্প সময়ের মধ্যে স্নায়ু-সহযোগে বাহ্যজ্ঞান মনোমধ্যে সঞ্চরণ করে, এবং মানসিক চেষ্টা অঙ্গা-দিতে সমাগত হয়, তাহা পরিমেয় নহে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, ব্যক্তি-বিশেষে ঐ সম-য়ের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের ঐপ্র-কার অনুমানের প্রধান মূল এই; সচরাচর এমত

ঘটিয়া থাকে, দুই ব্যক্তি দূরবীক্ষণ দ্বারা তারকা-বিশেষের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়ে এক সময়ে ঐ তারকার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন নিরীক্ষণ করে না; এক জন অগ্রে এবং এক জন তাহার পরে দেখে। কিন্তু এই স্থলে ঐ উভয় ব্যক্তির দর্শন ও শ্রবণ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য এক সময়ে হইতে থাকে। উহারা চক্ষুর্দ্বারা তারকার গতি নিরীক্ষণ করে, এবং কর্ণদ্বারা নিকটবর্ত্তী ঘড়ীর সেকেণ্ডের কাঁটার সঞ্চালন শুনিতে থাকে। আমা-দিগের মনে এক সময়ে দুই বিষয়ের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। দুই ইন্দ্রিয়ে দুইটী ঘটনা এক কালে উপস্থিত হইলে, মনোমধ্যে তাহাদিগের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে জন্মে, এবং ঐ উভয় জ্ঞান জন্মিবার মধ্যগত সময় সকল ব্যক্তির সমান হওয়া সম্ভব নহে। অত-এব, এমন হইতে পারে, ঐ উভয় পর্য্যবেক্ষণকারীরই তারকা দর্শন ও ঘড়ীর শব্দ শ্রবণ জ্ঞান, এক সময়ে মস্তিষ্কে নীত হইলেও, মনের জ্ঞানগ্রাহিতা শক্তির তারতম্যানুসারে উভয়ে এক সময়ে শুনিতে পাইয়াও এক সময়ে দেখিতে পায় না।

স্নায়ু সকল শরীরের অধিকাংশ স্থানে বিস্তৃত থাকিলেও যথায় নিঃশেষিত হইয়াছে, কেবল সেই স্থানেই কার্য্যকারিত্ব শক্তি প্রকাশ করে, অন্যত্র নহে।

যে সকল স্নায়ু হস্তাকুঞ্চনী-পেশী-লগ্ন হইয়াছে, তাহারা শরীরের অপর ভাগ দিয়া গমন করিলেও তাহাদিগের দ্বারা কেবল হস্ত আকুঞ্চিত হয়। দর্শন স্নায়ুর শেষ ভাগে আলোক স্পর্শ করিলেই মনোমধ্যে তাহার জ্ঞান জন্মে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেক স্নায়ু-সূত্রের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, যাহাদ্বারা গতি জন্মে, তাহাদ্বারা জ্ঞান জন্মে না; এবং যাহাদ্বারা জ্ঞান জন্মে, তাহাদ্বারা গতি জন্মে না। কেবল দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন জ্ঞান জননী স্নায়ু ভিন্ন প্রায় আর সকল স্নায়ুতেই ঐ উভয় প্রকার স্নায়ুসূত্র একত্র মিলিত আছে। কিন্তু যে সকল স্নায়ুদ্বারা জ্ঞান জন্মে, তাহাদিগের সকলের দ্বারা সকলপ্রকার জ্ঞান জন্মে না। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, এই ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়-গত স্নায়ুদ্বারা কেবল এক এক বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। দর্শন-স্নায়ু দ্বারা কেবল আলোকের জ্ঞান জন্মে; শ্রবণ-স্নায়ু দ্বারা কেবল শব্দের অনুভব হয়; ঘ্রাণ-জ্ঞান-জননী-স্নায়ু দ্বারা কেবল গন্ধ অনুভূত হয়; এবং রসন-স্নায়ু দ্বারা কেবল স্বাদ বোধ হয়। এই ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় দ্বারা বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জন্মে, বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ ইন্দ্রিয় কহে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা নানাবিধ জ্ঞান জন্মে। উহাদ্বারা আকার,

গঠন, ভার, কোমলত্ব, কাঠিন্য, শৈত্য, উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত ইহাকে সাধারণ ইন্দ্রিয় কহে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল জ্ঞান জন্মে, তাহা একপ্রকার স্নায়ু-সূত্রের সহযোগে জন্মিয়া থাকে, কি তত্তৎ জ্ঞান জননের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্নায়ু-সূত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, শারীরবিৎ পণ্ডিতেরা অদ্যাপি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। আমরা কোন দ্রব্য হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র, উহা কোমল কি কঠিন, তীক্ষ্ণ কি স্থূলধার, গোল কি চতুষ্কোণ, মসৃণ কি বন্ধুর, শীতল কি উষ্ণ, এককালে অনুভব করিয়া থাকি। অতএব, তত্তৎ কার্য্যের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্নায়ু নির্দ্দিষ্ট থাক্, বা একপ্রকার স্নায়ুদ্বারা ঐ সমুদায় বিশেষ বিষয়ের অনুভব হউক, স্পর্শজ্ঞানজননী স্নায়ু দ্বারা যে ঐ সকল জ্ঞান এককালে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে মনোমধ্যে সম্বেদিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

মনোগত ইচ্ছা বা অন্য কারণে স্নায়ু উত্তেজিত হইলেই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা তাড়িত প্রভৃতি নানাপ্রকার পদার্থ সংযোগ করিয়া স্নায়ুকে কৃত্রিমরূপে উত্তেজিত করিতে পারেন; তাহাতেই এক স্নায়ুতে যে গতিজনক ও জ্ঞান-জনক উভয়প্রকার স্নায়ুসূত্র থাকে, তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। যদি কোন ইতর জন্তুর মেরুদণ্ডগত-মজ্জা-

নিঃসৃত কোন স্নায়ুর গাত্র অঙ্গবিশেষ হইতে পৃথক্ করিয়া কোন প্রকারে উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে দ্বিবিধ ফল উৎপন্ন হয়। ঐ জন্তু যন্ত্রণাবোধক ভাব প্রকাশ করে, এবং যে অঙ্গে ঐ স্নায়ু সংলগ্ন থাকে, তাহা সঞ্চালিত হইতে থাকে। গতি-জনক স্নায়ু-সূত্র উত্তেজিত হওয়ায় তল্লগ্ন পেশী সঙ্কুচিত হইয়া সেই স্নায়ুলগ্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়; এবং জ্ঞানজনক স্নায়ুসূত্র উত্তেজিত হওয়ায় বেদনানুভব হয়।

জ্ঞানজননী স্নায়ু উত্তেজিত হইলে, উহার কার্য্য কেবল মস্তিষ্কে প্রকাশ পায়, এবং গতিজননী স্নায়ুর কার্য্য, যথায় ঐ স্নায়ু শেষিত হয় তথায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। যদি কোন স্নায়ু উল্লিখিত প্রকারে শরীর হইতে পৃথক করিয়া ও বন্ধনীবিশেষ দ্বারা উহার কোন স্থান দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া বন্ধনের নিম্নে উহা উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে কেবল গতিজননী স্নায়ুর কার্য্য হইতে থাকে, অর্থাৎ স্নায়ুলগ্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, কিন্তু মনোমধ্যে কোন বেদনা বোধ হয় না। যদি তাহা না করিয়া বন্ধনীর উপরিভাগ উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে গতিজননী স্নায়ুর কার্য্য না হইয়া কেবল মনোমধ্যে যাতনা অনুভূত হইতে থাকে। যদি দুইটি বন্ধনী দ্বারা ঐ স্নায়ুর দুই স্থান বন্ধন করিয়া এবং

মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল স্নায়ু-শাখা নির্গত হইয়াছে, তাহা কাটিয়া দিয়া উভয় বন্ধনীর মধ্যগত ভাগ উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে মনোমধ্যে কোনরূপ যাতনাও উপস্থিত হয় না, এবং কোন অঙ্গ সঞ্চালিতও হয় না। উপরিস্থ বন্ধনী দ্বারা জ্ঞানজননী স্নায়ুর কার্য্য-নিরোধ হয়, এবং অধঃস্থ বন্ধনী দ্বারা গতিজননী স্নায়ুর কার্য্য-ব্যাঘাত হয়। যদি সেই সময়ে উপরিস্থ বন্ধনী উঠাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মনোমধ্যে যাতনা উপস্থিত হয়; কিন্তু কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হয় না। যদি অধঃস্থ বন্ধনী উঠাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কোন যন্ত্রণা বোধ হয় না, কিন্তু ঐ স্নায়ুলগ্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। যদি বন্ধনীদ্বারা বদ্ধ না করিয়া ও স্নায়ু হইতে নির্গত শাখাগুলি না কাটিয়া ঐরূপ উত্তেজনা করা যায়, তাহা হইলে উত্তেজিত স্থানের নিম্নস্থ শাখাগুলি যে যে অঙ্গে লগ্ন আছে, সেই সেই অঙ্গ চালিত হয়, উত্তেজিত স্থানের উপরি হইতে স্নায়ুশাখা নির্গত হইয়া যে সকল অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অঙ্গ সঞ্চালিত হয় না। সেইপ্রকার উত্তেজিত স্থানের নিম্ন-দিয়া নির্গত স্নায়ু শাখা যে সকল অঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্গ ভিন্ন আর কোন স্থানে যাতনা অনুভব হয়না, উত্তেজিত স্থানের উপরিভাগ হইতে স্নায়ুশাখা নির্গত হইয়া

যে যে অঙ্গে গমন করিয়াছে, তাহাতে কোন রূপ যাতনা বোধ হয় না।

যদি উল্লিখিত মত কোন স্নায়ু না বাঁধিয়া উহার কোন স্থান কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐরূপ ফলোৎপত্তি হইবে, অর্থাৎ নিম্নস্থ ছিন্ন মুখ উত্তেজিত করিলে তন্নিম্ন হইতে নির্গত স্নায়ুশাখা যে সকল অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্গ সঞ্চালিত হইবে। কিন্তু কাটিয়া দিবার অব্যবহিত পরেই ঐরূপ উত্তেজনা করিতে হইবে, যেহেতু স্নায়ু কিছু কাল মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডগত মজ্জা হইতে সংযোগ রহিত হইলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যদি উপরিস্থ ছিন্ন মুখ উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে অধঃস্থ ছিন্ন ভাগ সংলগ্ন স্থানে যেন বেদনা লাগিতেছে, এইরূপ বোধ হইতে থাকে। স্নায়ুর এই ধর্ম্ম অতীব চমৎকার-জনক। কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে তদঙ্গ-ব্যাপ্ত যে সকল স্নায়ুর ছিন্ন মুখ শরীরলগ্ন থাকে, তাহারা কোনপ্রকারে উত্তেজিত হইলে অপগত অঙ্গে বেদনার অনুভব হয়। শরীর-লগ্ন ছিন্ন মুখ যে অবধি না শুকায়, তদবধি ঐরূপ জ্ঞান অতিশয় প্রবল থাকে। হস্তে বা পদে অসাধ্য ক্ষতাদি রোগ জন্য কোন ব্যক্তির হস্তের বা পদের এক ভাগ কাটিয়া ফেলিলে রোগী, শরীর-বিচ্ছিন্ন অঙ্গে বেদনার কথা কহিয়া থাকে।

যেস্থানে কাটিয়া ফেলা যায়, সে স্থানের অস্ত্রক্ষত শুকাইয়া গেলেও বিচ্ছিন্ন অঙ্গ শরীরসংযুক্ত থাকিলে সুস্থাবস্থায় বাহ্য কারণে তদঙ্গে যেরূপ বেদনা অনুভূত হইত, সেইরূপ অনুভূত হয়। ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিরা অপগত অঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে বেদনার কথা কহিয়া থাকে। ছেদিত অঙ্গ যদি পাদের এক ভাগ হয়, তবে কখন তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে, কখন বা পদতলে, কখন বা গুল্‌ফে বেদনার কথা কহে। পণ্ডিত মূলর কহেন, ছিন্নাঙ্গে ঐরূপ বেদনানুভাবকতা শক্তি চিরকাল থাকে, কেবল ক্রমে ক্রমে সেইরূপ বেদনানুভবের অভ্যাস হইয়া যায় বলিয়া লোকে তাহার আর উল্লেখ করে না। মূলর ইহার উদাহরণস্থলে কয়েক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এক সেনার বিবরণ অতীব চমৎকারজনক। ১৮০৩ সালে ঐ সেনার বাহুতে একটী গোলা লাগিয়া বাহু ভাঙ্গিয়া যায়। চিকিৎসকেরা কফোণির উপরি বাহুচ্ছেদ করিয়া দেন। ২০ বৎসর পরে তাহার অপগত বাহুভাগে বাত রোগের অনুভব হইয়া বাতজ বেদনা তাহার সর্ব্ব স্থানে বোধ হইয়াছিল। তাহার পর মধ্যে মধ্যে ঐরূপ বেদনার অনুভব হইত। ঐ ব্যক্তির ঐ প্রকার বেদনাজ্ঞান মৃত্যুপর্য্যন্ত ছিল। অতএব, স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে,

গতিজননী স্নায়ু উত্তেজিত হইলে সেই স্নায়ু যে স্থলে নিঃশেষিত হয়, সেই স্থলের সহিত যদি উত্তেজিত স্নায়ুর সংযোগ অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে সেই স্থল সঞ্চালিত হয়; এবং জ্ঞানজননী স্নায়ু উত্তেজিত হইলে যদি উত্তেজিত অংশের সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ থাকে, তাহা হইলে বেদনার অনুভব হয়। অপিচ, স্নায়ুর জ্ঞানজননী শক্তি ঊর্দ্ধ দিকে ও গতি-জননী শক্তি নিম্ন দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন পরীক্ষাদ্বারা গতিজননী ও জ্ঞানজননী উভয় প্রকার স্নায়ুর কার্য্য-স্বতন্ত্রতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত স্নায়ুর বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম পরীক্ষাদ্বারা অবধারিত হইয়াছে। পণ্ডিত মেগেণ্ডি পরীক্ষা করিয়াছেন, চক্ষুতে আঘাত করিয়া দর্শন-স্নায়ু উত্তেজিত করিলে কোন বেদনা অনুভূত হয় না, কেবল ক্ষণিক আলোক-বিশেষের দর্শন হইয়া থাকে। তদ্রূপ, দীর্ঘকাল ভ্রমণ-জন্য সর্ব্বদা মস্তকের আন্দোলনদ্বারা বা কোন পীড়া-বিশেষে শ্রবণ-স্নায়ু উত্তেজিত হইলে কেবল একপ্রকার গীতশব্দ বা ঝন্ ঝন্ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ফলতঃ শারীরবিৎ পণ্ডিতেরা অনেকপ্রকার পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানজননী স্নায়ুদ্বারা কেবল তত্তৎ ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান জন্মে,

তদ্ভিন্ন তাহাতে আর কোনরূপ কার্য্যকারিতা দেখা যায় না।

এইরূপে স্নায়ুদ্বারা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের মনোমধ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকে; এবং আমরা যে অঙ্গ যখন সঞ্চালন করিবার অভিলাষ করি, সেই অঙ্গের পেশী সঙ্কুচিত হইয়া তদঙ্গের চালনা করে।

মেরুদণ্ড-গত মজ্জা—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মেরুদণ্ডের মধ্যে স্নায়ুর যে মূল থাকে, তাহাকে মেরুদণ্ড-গত মজ্জা কহে। ঐ মজ্জা, মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃষ্ঠ-বংশের সমুদায় দৈর্ঘ্যের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, কয়েকটা পৃথক্ পৃথক্ রজ্জুবৎ মজ্জা মিলিত হইয়া উহা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল রজ্জু পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একীভূত হয় নাই। উহাদিগকে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ করা যাইতে পারে। ঐ মজ্জার সকল স্থল সমানাকার নহে, মধ্যভাগ অপেক্ষা ঊর্দ্ধস্থ ও অধঃস্থ ভাগ স্থূল। উহার নিম্নান্ত হইতে কতকগুলি স্নায়ু নির্গত হইয়া পৃষ্ঠবংশের নিম্ন-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মজ্জার দুই পার্শ্ব-হইতে যুগ্ম যুগ্ম হইয়া যেমন স্নায়ু সকল নির্গত হইয়াছে, তন্নিম্নস্থ স্নায়ু হইতেও সেইরূপ স্নায়ু সকল নির্গত হইয়া শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

মেরুদণ্ড-গত মজ্জাকে চারি অংশে বিভক্ত করা যায়। ঐ চারি অংশের দুই অংশ করিয়া শরীরের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। এক এক পার্শ্বগত অংশদ্বয় একটী পাংশু-বর্ণ রেখা দ্বারা বিভাজিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মেরুদণ্ডোদ্গত প্রত্যেক্ স্নায়ুর দুইটী মূলের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, ঐ রেখার উপরিস্থ অংশ হইতে তাহার একটী মূল এবং নিম্নস্থ অংশ হইতে অপর মূল নির্গত হইয়াছে। উপরিস্থ অংশোদ্গত মূলকে পুরোমূল, এবং নিম্নস্থ অংশোদ্ভব মূলকে পশ্চাৎ মূল নামে নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে।

যেমন মেরুদণ্ড-নিঃসৃত স্নায়ুর সহিত তদ্গত মজ্জার সংস্রব আছে, সেইপ্রকার মস্তিষ্কের সহিত মেরুদণ্ডগত মজ্জার সংযোগ আছে। স্নায়ুদ্বারা যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহার মূল কারণ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কই আমাদিগের মনোযন্ত্র; মনোমধ্যে ইচ্ছা হইলেই আমরা অঙ্গাদি সঞ্চালন করিয়া থাকি, এবং বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান মনোমধ্যেই জন্মিয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, অঙ্গ-সঞ্চালনী চেষ্টা মেরুদণ্ড-গত মজ্জা দিয়া স্নায়ুতে গমন করে, এবং বাহ্যজ্ঞান ঐ পথেই মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং মেরুদণ্ড-গত মজ্জাকে তন্নিঃসৃত স্নায়ু ও মস্তিষ্কের সংযোগ-পথ বলিতে হইবে। কিন্তু কিরূপ ভাবে

ঐ মজ্জা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত, অর্থাৎ স্নায়ুসূত্র-সকল ঐ মজ্জায় প্রবেশ করিয়াও পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া ঊর্দ্ধগত হইয়া মস্তিষ্কের সহিত মিলিত হইয়াছে, অথবা উহারা তথায় মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিত-দিগের তদ্বিষয়ে মতামতি আছে। যাহাহউক, সর্ চার্লস বেল, ম. ফ্লোরেন্স, মূলর, মেগেণ্ডি, লঙ্গেট, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিতদিগের মত এই, স্নায়ুসূত্রসকল পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া মেরুদণ্ডমধ্য দিয়া গিয়া মস্তিষ্কের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, মজ্জা-নিঃসৃত কোন স্নায়ুর পুরোমূল যদি উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে শরীরের যে স্থানে ঐ স্নায়ু গমন করিয়াছে; সেই স্থান সঞ্চালিত হইবে; কিন্তু তথায় কোনপ্রকার বেদনানুভব হইবে না। যদি পশ্চাৎ মূল উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে কেবল বেদনানুভব হয়, কিন্তু কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হয় না। যদি পুরোমূলটী কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্নায়ু-লগ্ন অঙ্গ গতিরহিত হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহার বাহ্যপদার্থের জ্ঞান-জনকতা শক্তি থাকে। যদি পশ্চাৎ মূলটী ব্যবচ্ছেদ করা যায়, তাহা হইলে সেই স্নায়ুলগ্ন অঙ্গের জ্ঞান-জনকতা-শক্তির লোপ হয়, কিন্তু তাহার গতিশক্তির ব্যাঘাত হয় না। যদি

উভয় মূল ছেদ করাযায়, তাহা হইলে ঐ স্নায়ুলগ্ন অঙ্গ গতিরহিত ও অসাড় হইয়া উঠে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, স্নায়ু মেরুদণ্ড-গত মজ্জার নিকট-বর্ত্তী হইয়া যে দুই মূলে বিভক্ত হয়, তাহারা পরস্পর ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত; পুরোমূলের সূত্রগুলি গতিজনক এবং পশ্চাৎমূলের সূত্রগুলি জ্ঞানজনক। কিন্তু পুরোমূল মজ্জার সম্মুখে ও পশ্চাৎমূল তাহার পশ্চাদ্দেশে নিবদ্ধ, অতএব, ইহা স্বতই বোধ হইতে পারে, ঐ ঐ মূলের স্নায়ুসূত্র-সকল মজ্জার ঐ ঐ ভাগ দিয়া মস্তিষ্কে মিলিত হইয়াছে। তাহা হইলেই, মজ্জার সম্মুখ-ভাগ দ্বারা গতিজনন ও পশ্চাৎভাগ দিয়া জ্ঞানজনন কার্য্য হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারাও তাহাই সপ্র-মাণ হইয়াছে। মজ্জার পশ্চাৎভাগ উত্তেজিত করিলে যাতনানুভব হইয়া থাকে, এবং সম্মুখভাগ উত্তেজিত করিলে অঙ্গ-বিশেষের চালনা হয়। কিন্তু ঐরূপ পরীক্ষা নিঃসন্দেহ হইবার অনেক প্রতিবন্ধক আছে। তন্মধ্যে একটী এই, শরীরব্যাপ্ত স্নায়ুমধ্যে যেমন প্রত্যেক সূত্র এক একটী আবরণে আবৃত আছে, এবং তাহাতে একটী সূত্রের শক্তি অপর সূত্রে সঞ্চারিত হইতে পারে না, মজ্জাস্থ সূত্রগুলি সেরূপ নহে, উহারা সেরূপ কোন আবরণে আবৃত নাই, সুতরাং একটী স্নায়ুসূত্রের শক্তি তৎপার্শ্বগত অপরাপর সূত্রে সংক্র-

মিত্ত হইয়া থাকে। এই হেতু, মজ্জার সম্মুখভাগ উত্তেজিত করিলে সেই সঙ্গে তাহার পশ্চাৎভাগস্থ সূত্র সকল উত্তেজিত হইয়া থাকে, এবং পশ্চাৎভাগ উত্তেজিত করিলেও সম্মুখভাগের সূত্র সকল উত্তেজিত হয়। ইহাতেই কোন্ ভাগস্থ স্নায়ুসূত্রের কিরূপ ধর্ম্ম, তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইতে পারে না। কোন কোন পণ্ডিত কহেন, মজ্জার সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ বাস্তবিক দুই ভাগ নহে। কাহারও মতে মজ্জার পশ্চাৎভাগে কিছু গতিজননের শক্তি আছে। কেহ গতিজননী ক্ষমতা মজ্জার শুভ্রভাগে, কেহ বা পাংশুবর্ণ ভাগে নির্দ্দেশ করেন। যাহাহউক অনেকের এই মত মজ্জার গতিজননের শক্তি সম্মুখভাগে এবং জ্ঞানজননের ক্ষমতা পশ্চাৎভাগে আছে।

মস্তিষ্ক—মস্তিষ্ক স্নায়ুর মূলদেশ। সুতরাং উহাই আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক সমুদায় কর্ম্মের অধিকর্ত্তা। উহাই আমাদিগের বুদ্ধি ও ইতর প্রাণীর সংস্কারের স্থান। অতএব, ইতরেতর জীবভেদে সংস্কারবত্তার ও বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষাপকর্ষ দেখিয়া মস্তিষ্কের তদনুসারী তারতম্য থাকা সম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিকও তাহাই আছে। সকল জন্তুর মস্তিষ্কের পরিমাণ সমান নহে। শরীর অনুসারে

ধরিলে মনুষ্যের মস্তিষ্কই সমুদায় জীব অপেক্ষা অধিক হয়। মনুষ্যের মধ্যেও সকলের মস্তিষ্ক সমপরিমিত নহে। জড় ও অল্পধী ব্যক্তি অপেক্ষা সুস্থমনাঃ ও বুদ্ধিমান্ লোকের মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক।

মিকেল প্রভৃতি কতিপয় শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত স্ত্রীলোকের শরীরের সহিত পুরুষের শরীরের তুলনা করিয়া শরীর অনুসারে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ম. পার্সপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক এক একাদশাংশ অধিক, এবং পুরুষের শরীর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীর এত অল্প ভার নহে যে, ঐ ন্যূনতা পোষাইয়া যায়।

মস্তিষ্কের সকল স্থানদ্বারা সমান কার্য্য হয় না। উহার ভিন্ন ভিন্ন ভাগদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। পণ্ডিতেরা উহাকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রধান ৩টী—বৃহন্মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও দীর্ঘীভূত-মজ্জা। এ স্থলে এই প্রধান তিন ভাগের কিছু কিছু বিবরণ লেখা যাইবে। প্রথমতঃ দীর্ঘীভূত-মজ্জার বিবরণ লিখিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও বৃহন্মস্তিষ্কের বিবরণ লিখিত হইবে।

দীর্ঘীভূত মজ্জা—মেরুদণ্ডগত-মজ্জার যে ভাগ মস্তকমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা দীর্ঘীভূত-মজ্জা

নামে নির্দ্দিষ্ট হইল। দীর্ঘীভূত-মজ্জা হইতে দুইটী শাখা উদ্‌গত হইয়া বৃহন্মস্তিষ্কের সহিত মিলিত হইয়াছে। দীর্ঘীভূত-মজ্জা মেরুদণ্ডগত-মজ্জার একটী অংশ, সুতরাং ঐ মজ্জার যে যে ধর্ম্ম আছে, ইহাতেও সেই সেই ধর্ম্ম লক্ষিত হয়। দীর্ঘীভূত-মজ্জার কোন স্থান কাটিয়া ফেলিলে, উহার অধোভাগস্থ মজ্জা-লগ্ন স্নায়ু শরীরের যে যে স্থানে গমন করিয়াছে, তৎসমুদায় স্থান গতিরহিত ও অসাড় হইয়া যায়। কিন্তু ঐ ঐ ধর্ম্ম ব্যতীত দীর্ঘীভূত-মজ্জার আরও বিশেষ ধর্ম্ম আছে। যদি মেরুদণ্ডগত-মজ্জার নিম্নভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে উপরে উপরে কাটিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে যে ভাগ যখন কাটা যায়, সেই ভাগ-নিঃসৃত স্নায়ু সকল যে যে অঙ্গে ব্যাপ্ত থাকে, সেই সেই অঙ্গ গতিরহিত ও অসাড় হইতে থাকে। পৃষ্ঠদেশের উচ্চভাগস্থ মজ্জা ক্রমে ক্রমে শরীর হইতে অন্তরিত করিলে, প্রথমতঃ কেবল শ্বাসকার্য্য অল্পে অল্পে নিস্তেজ হইতে থাকে। তাহার পর পৃষ্ঠদেশীয় মজ্জার সর্ব্বোচ্চ স্থান পর্য্যন্ত অন্তরিত করিলে, পঞ্জরের সঞ্চালন ক্রিয়া থামিয়া যায়, কেবল উদর-বিতান দ্বারা অল্প অল্প শ্বাসক্রিয়া হইতে থাকে। তাহা অপেক্ষা উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত অন্তরিত করিলে, তাহাও থামিয়া কেবল হাঁপানি হইতে থাকে।

যদি তাহা অপেক্ষা ঊর্দ্ধদেশ-পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে শ্বাসক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে রহিত হইয়া যায়, ও প্রাণ বিনষ্ট হয়। যে স্থান কাটিয়া ফেলিলে ঐ ঘটনা হয়, তাহা দীর্ঘীভূত মজ্জায় আছে। ঐ স্থানকে প্রাণস্থান কহে।

যদি মস্তিষ্কের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহন্মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অংশ করোটী হইতে অন্তরিত করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ নাশ হয় না; ঐ ঐ স্থানের ধর্ম্মগত-কার্য্যের বিলোপ হয় মাত্র। কিন্তু দীর্ঘীভূত মজ্জার অন্তর করিলেই তৎক্ষণাৎ জীবন বিনষ্ট হয়। অতএব, প্রতিপন্ন হইতেছে, দীর্ঘীভূত মজ্জায় এমন এক স্থান আছে, যাহা বিরহিত হইবামাত্র আমাদিগের প্রাণ বিনাশ হয়; এবং ঐ স্থান দীর্ঘীভূত মজ্জা ভিন্ন মস্তিষ্কের অপর কোন ভাগে নাই।

শরীরের স্নায়ু-যন্ত্রের কোন স্থানে যে ঐরূপ প্রাণস্থান আছে, তাহা পণ্ডিত লরী প্রথম সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তিনি উহা টগ্রবেয় প্রথম ও তৃতীয় কশেরুকার মধ্যগত মজ্জায় আছে বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর, লি. গালোইস্ ঐ স্থান নির্ণয় করিতে যত্ন করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও সফলা হয় নাই। অবশেষে উহা নিশ্চিত-রূপে অবধারিত করিবার খ্যাতি

ম. ফ্লোরেন্সের ভোগ্য হয়। তিনি উহা দীর্ঘীভূত মজ্জাস্থ আমাশয়-ফুস্ফুসীয় স্নায়ুমূলে নির্দ্দেশ করেন।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক—ইহা করোটীর পশ্চাৎ ও অধোভাগে বৃহন্মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত। ইহা হইতে ত্রিযুগল শাখা নির্গত হইয়াছে। ঐ শাখাযুগলত্রয়ের এক যুগল ঊর্দ্ধগত হইয়া বৃহন্মস্তিষ্কে মিলিত হইয়াছে, এক যুগল অধোগত হইয়া দীর্ঘীভূত মজ্জার সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং তৃতীয় যুগল সম্মুখ দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

বারম্বার উল্লেখ করা গিয়াছে, গতিজননী স্নায়ু দ্বারা পেশী সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের গতিসাধন করে, এবং মনোগত ইচ্ছা ঐ গতিজননের মূল। কিন্তু যথানিয়মে গতিক্রিয়া সাধন করা একটী স্বতন্ত্র কার্য্য। উহা ঐ উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। ঐ কার্য্য ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ম. ফ্লোরেন্স ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, মস্তিষ্কের ঐ ভাগ অন্তরিত করিলে, নিয়মিত রূপে অঙ্গাদি চালনার ব্যত্যয় হয়। তখন ইচ্ছাশক্তির অভাব হয় না, এবং অঙ্গাদি সঞ্চালিত করিবারও শক্তি থাকে। কেবল নিয়মিত রূপে সঞ্চালন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না। কোন জন্তুর মস্তিষ্কের অপরাপর ভাগ অবিক্ষিপ্ত রাখিয়া ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অন্তরিত

করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ জন্তু আপনা হইতে চলিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছানুরূপ পাদবিক্ষেপ করিতে ও শরীর স্থির রাখিয়া চলিতে পারে না। নিয়মিত গতিশক্তি থাকিতে উহা যে কার্য্যের নিমিত্ত, যথায় যেরূপ যাইতে পারিত, তাহার সর্ব্বথা ব্যত্যয় হয়। সচরাচর যে জন্তু যেরূপ চলে, তাহার সেই প্রকার গতিক্রিয়ার ঐ ক্রটী স্পষ্ট-রূপে লক্ষিত হয়। যে সকল পক্ষী পদচারী, তাহাদিগের গমন-ক্রিয়ায় উড্ডয়নশীল পক্ষীর উড্ডয়নকালে এবং জলচর পক্ষীর সন্তরণ-কালে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অভাবে যথানিয়মে তত্তৎ কার্য্য-সম্পন্নের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহন্মস্তিষ্ক—কৃমিরাশি এক স্থানে জড়িত হইয়া থাকিলে, যেরূপ দেখায়, বৃহন্মস্তিষ্কের আকার তাদৃশ। অপর ভাগদ্বয় অপেক্ষা ইহার পরিমাণ অধিক। সমুদায় মস্তিষ্ক ১০০, এই রাশিদ্বারা ব্যক্ত করিলে বৃহন্মস্তিষ্কের পরিমাণ ৮৭ $\frac{১}{২}$ বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত ক্রুভিল হায়র পরীক্ষা করিয়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মস্তকে প্রায় ⁄১ একশের হইতে ⁄১৷৷৴০ একশের দশ ছটাক পর্য্যন্ত বৃহন্মস্তিষ্ক দেখিয়াছেন। হস্তী, তিমি, ডল্‌ফিন ভিন্ন সমুদায় ইতরেতর জীব অপেক্ষা মনুষ্যের বৃহন্মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক। হস্তী ও তিমির বৃহন্মস্তিষ্কের পরিমাণ প্রায় ⁄১।৴০ ও ডল্-

ফিলের /১৷৷৶০ হইবে। কিন্তু ঐ ঐ জীবের শরীরের ভারের সহিত তাহাদিগের বৃহন্মস্তিষ্কের তুলনা করিলে মনুষ্যের শরীরের ভার অনুসারে তাহার বৃহন্মস্তিষ্কের পরিমাণ অনেক অধিক হয়। মনুষ্যের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকের সমান পরিমিত বৃহন্মস্তিষ্ক নাই। শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, আফ্রিক্ বর্ণের লোক অপেক্ষা ককেশীয় বর্ণের লোকের বৃহন্মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক *। একবর্ণের লোকের মধ্যেও বৃহন্মস্তিষ্কের ন্যূনাধিক্য আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের বৃহন্মস্তিষ্ক, অপেক্ষাকৃত অল্পধী-ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক। ম, লিনটের পরীক্ষানুসারে জড় অপেক্ষা সুস্থমনাঃ ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক অধিক সপ্রমাণ হইয়াছে; এবং ঐ আধিক্য মস্তিষ্কের অপরাপর ভাগ হইতে বৃহন্মস্তিষ্কেই অধিকতঃ লক্ষিত হইয়াছে।

বৃহন্মস্তিষ্ক আমাদিগের মানসিক শক্তি সমুদায়ের প্রকৃত বাসস্থান ও সমুদায় জ্ঞানের আলয়। আমরা

---

* প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মনুষ্যজাতিকে পাঁচ প্রধান বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন—ককেশীয়, মোগল, মালাই, আমেরিক্ ও আফরিক্। ইহাদিগের মধ্যে ককেশীয় বর্ণের লোক সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মজ্ঞ। স্কটলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ইহাদিগের দ্বারা অধিবাসিত। আফরিক্ বর্ণের লোক অতি নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ। আফরিকা ও ভারতসাগরীয় দ্বীপ ইহাদিগের বসতিস্থান।

স্মরণ, মনন, চিন্তন, যাহা কিছু করি, তৎ সমুদায়ই বৃহন্মস্তিষ্কে হইয়া থাকে; এবং সেই স্থানেই সমুদায় বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। মস্তিষ্কের অপরাপর ভাগের সহিত তত্তৎ বিষয়ের সম্বন্ধ নাই। পরীক্ষাদ্বারা অবধারিত হইয়াছে, কোন জন্তুর বৃহন্মস্তিষ্ক নষ্ট করিলেও, ঐ জন্তু জীবিত থাকে; এবং উহার গতি-ক্রিয়ারও অভাব হয় না; কিন্তু উহার কোন প্রকার মানসিক চেষ্টা থাকে না। তখন উহা আপনা হইতে চলিতে পারে না। উহাকে চালাইয়া দিলে চলিয়া যায়; কিন্তু কি নিমিত্ত চলিতেছে, তাহা জানি-তে পারে না। উহার সম্মুখে কোন পদার্থ রাখিলে, সেই পদার্থের প্রতিকৃতি উহার চক্ষুষ্পটে পতিত হয়; কিন্তু উহার সেই বস্তুর দর্শন-জ্ঞান জন্মে না। তৎকালে উহা কোন শব্দ শুনিতে পায় না, এবং বস্তু বিশেষে উহার শরীর লগ্ন হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হই-লেও তাহা বুঝিতে পারে না। মস্তিষ্কের অপর কোন ভাগ অন্তরিত করিলে ঐরূপ ঘটে না। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অন্তর করিলে গতিক্রিয়ার নিয়ম থাকে না, কিন্তু মানসিক শক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না। মেরু-দণ্ডগত-মজ্জা নষ্ট করিলে, যখন যে ভাগ নষ্ট করিবে, তখন তদধঃস্থ সমুদায় শরীর অসাড় ও গতিরহিত হইয়া যাইবে; কিন্তু স্মরণ, মনন, চিন্তন প্রভৃতি

কার্য্য অবিঘ্নিত থাকিবে। রোগ-বিশেষের চিকিৎসা দ্বারাও প্রত্যক্ষ হয়, বৃহন্মস্তিষ্ক কোন প্রকারে অসুস্থ হইলে রোগীর বিহ্বলতা ও অচেনতা জন্মে; এবং তাহার প্রতীকার হইলেই সে সমুদায় উপদ্রব শান্ত হইয়া যায়।

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই, বৃহন্মস্তিষ্ক আমাদিগের সমুদায় মানসিক শক্তির স্থান বটে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রত্যেক মানসিক শক্তির নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যেহেতু কখন কখন এক বা অধিক মানসিক শক্তি নষ্ট হইলেও অপর শক্তিগুলি অব্যাহত থাকে। কিন্তু ম. ফ্লোরেন্স পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বৃহন্মস্তিষ্কের অপরাপর অংশগুলি অব্যাহত রাখিয়া যত্নপূর্ব্বক কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ-বিশেষের অন্তর করিলে, কোন মানসিক শক্তির অভাব হয় না; কিন্তু উহার কিছু অতিক্রম করিলেই সমুদায় শক্তি নিস্তেজ হয়, এবং অধিক অতিক্রম করিলেই সমুদায় শক্তির অভাব হয়। যাহা হউক, কেবল বৃহন্মস্তিষ্কই যে সমুদায় মানসিক শক্তির আধার তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

গ্রন্থিময় স্নায়ু—শরীরের কোন্ স্থানে ইহার মূল দেশ তাহা অবধারিত হয় নাই। ইহার স্থানে স্থানে অসঙ্খ্য গ্রন্থি আছে, তাহাতেই ইহা ঐ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার গ্রন্থি সমুদায় পরস্পর

স্নায়ু-রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত। ঐ সকল স্নায়ু-রজ্জুর এক মুখ প্রায় সমুদায় মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুর সহিত সংযুক্ত আছে, এবং অপর মুখ অসঙ্খ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রে পরিণত হইয়া শরীরের আবশ্যক স্থলে ব্যাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থিময়-স্নায়ু শরীরের বাম ও দক্ষিণ উভয় ভাগে সমানরূপ বিস্তৃত। ঊর্দ্ধভাগে মস্তক এবং অধোভাগে বস্তি পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি নিরীক্ষিত হয়। মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু-দ্বারা যেমন শরীরের গতিজনন ও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানজনন সমাধা হয়, ইহাদ্বারা ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া যে সকল শারীরিক কর্ম্ম হয়, তৎ সমুদায় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ভুক্তান্নের পরিপাক, শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চার প্রভৃতি ইচ্ছার অধীন নহে। ঐ সমুদায় কার্য্য গ্রন্থিময় স্নায়ু-দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। গ্রন্থিময় স্নায়ুদ্বারা শরীরের অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়। মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুসূত্রদ্বারা মানসিক গতিজনন চেষ্টা অঙ্গাদিতে ব্যাপ্ত হয়, এবং বাহ্যজ্ঞান মনোমধ্যে সঞ্চরণ করে। মেরুদণ্ডগত-মজ্জা মস্তিষ্কের সহিত শরীরব্যাপ্ত স্নায়ুসূত্রের সংযোগ-পথ। দীর্ঘীভূত-মজ্জা দ্বারা বিশেষরূপে শ্বাসক্রিয়া

নির্ব্বাহিত হয়, এবং উহাতে এমন একটী স্থান আছে, যাহার অভাব হইলেই একেবারে জীবন বিনষ্ট হয়। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দ্বারা শরীরের গতিক্রিয়া নিয়মিত হয়। বৃহন্মস্তিষ্ক আমাদিগের মনোযন্ত্র। ঐ স্থান হইতে স্মরণ, মনন, চিন্তন, ইচ্ছাপ্রকাশ প্রভৃতি সমুদায় ক্রিয়া হয়; শরীরের গতিক্রিয়ার চেষ্টা হয়; ঐ স্থানেই সমুদায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান জন্মে; কোন অঙ্গে কোন প্রকার পীড়া হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান উপস্থিত হয়; এবং ঐ স্থান হইতেই তাহার শান্তির চেষ্টা হইয়া থাকে। এই সমুদায় অংশগুলি পরস্পর পরস্পরের অধীন, এবং সমুদায় অংশ দীর্ঘীভূত মজ্জার প্রাণস্থানের অধীন। অপরাপর অংশগুলির একের অভাবে অন্যের কার্য্য-সম্পন্নের ব্যতিক্রম হয় মাত্র। কিন্তু দীর্ঘীভূত মজ্জার প্রাণস্থানের অভাবে সকলেরই এককালে কার্য্য রহিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

রক্ত-সঞ্চার।

শরীরের কিছু কিছু ভাগ অবিরতই ক্ষয় পাইতেছে। শারীরবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কোন নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে শরীর সর্ব্বতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐ কালের পূর্ব্বে শরীরে যে পদার্থ থাকে, ঐ কালের পর তাহার আর কিছুই থাকে না; সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ তাহার স্থান অধিকার করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মতানুসারে ঐ কাল সাত বৎসরাত্মক গণিত ছিল, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা উহার পরিমাণ ৩০ দিনের অনধিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাহউক, যেমন কোন পদার্থ দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হইলে জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেইরূপ, শরীরস্থ পদার্থ জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া নিয়তই স্বেদ ক্লেদাদির আকারে শরীর হইতে অন্তরিত হইতেছে। যদি এইরূপ ক্ষতি ক্রমাগত হইতে থাকে, এবং অন্য কোন রূপে ক্ষতি পূরণ না হয়, তাহা হইলে অল্প কাল মধ্যেই শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়। অপিচ, জন্মাবধি শরীরের পরিণতাবস্থা পর্য্যন্ত আমাদিগের আকার ও ভার বৃদ্ধি হয়, অতএব, সেই সময়ে শরীরের প্রাত্যাহিক ক্ষতি পূরিত হইবার উপায় মাত্র থাকিলে চলে না,

তৎকালে যাহাতে ক্ষতি পূরণ ও শরীরের সম্বর্দ্ধন হয়, এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা দ্বারা শরীরের ক্ষতি পূরণ ও সম্বর্দ্ধন হয়, তাহাকে রক্ত কহে। রক্ত শরীরের সর্ব্বাবয়বে উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। রক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, যন্ত্র-বিশেষ দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য হইতে, ও নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু হইতে তাহা সংগৃহীত হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, শরীরের রক্ত-সঞ্চার, শ্বাস-ক্রিয়া এবং অন্ন পরিপাক পরস্পর পরস্পরের উপর সম্যক্ নির্ভর করে।

রক্তের প্রকৃতি—রক্তে যে পরিমিত যে পদার্থ আছে, শরীরেও সেই পরিমিত সেই পদার্থ আছে, রক্তস্থ সেই সকল পদার্থ শরীরে সংযুক্ত হইয়া শরীরের বৃদ্ধি করে। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, শরীর ও রক্ত উভয়েই শতকরা ৭৭ হইতে ৭৯ অংশ জল এবং অবশিষ্ট অংশে স্নৈহিক, সৌত্রিক ও মৃদ-লবণ প্রভৃতি নানাপ্রকার পদার্থ আছে। ঐ সকল পদার্থ দ্বারা শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

শরীর হইতে রক্ত-স্রাব হইলে শরীর দুর্ব্বল হয়, অধিক পরিমাণে হইলে মূর্চ্ছা ও চৈতন্য-শূন্যতা উপস্থিত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হয় এবং শরীর নিস্পন্দ হইয়া যায়, ফলতঃ জীবনের আর কোন চিহ্নই দেখা

যায় না। রক্ত-স্রাব নিবৃত্তি না হইলে অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। কিন্তু শরীর হইতে যৎপরিমিত রক্ত নির্গত হয়, যদি সেই সময়ে শরীরস্থ শিরায় সেই পরিমিত রক্ত প্রবেশিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার চৈতন্যাগম হয়, ও নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া জীবন সঞ্চার হয়।

রক্ত, কতকগুলি লাল ও শ্বেতবর্ণ অতি ক্ষুদ্রতম ডিম্ববৎ গোলাকার বস্তু ও একপ্রকার তরল পদার্থ মাত্র। ঐ লালবর্ণ ডিম্বগুলিকে শোণবিন্দু এবং ঐ তরল পদার্থকে মস্তু কহে। মস্তু স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। উহাতে যে সকল লোহিতবর্ণ ডিম্ব ভাসমান আছে, তাহাতেই উহার লৌহিত্য জন্মিয়াছে। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, রক্তস্থ শোণবিন্দুগুলি শরীর রক্ষার নিমিত্ত অধিক কার্য্যকর। রক্তস্রাবে যে জন্তু মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার শরীরে মস্তু প্রবেশিত করিয়া দিলে, তাহার কিছুই উপকার হয় না। উহা প্রবেশিত করিয়া না দিলেও ঐ জন্তু মরিয়া যাইত, প্রবেশিত করিয়া দেওয়াতেও জীবিত হয় না।

উল্লিখিত শোণবিন্দু ব্যতীত রক্তে যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ববৎ গোলাকার বস্তু আছে, উহাদিগের একপ্রকার ডিম্ব-গুলিকে শ্বেত ডিম্ব ও অন্যপ্রকারকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বলিয়া শ্বেত-ডিম্বাণু কহে। ঐ

সকল পদার্থ এত সূক্ষ্ম যে একটী সূচীর অগ্রে যতটুক রক্ত তিষ্ঠিতে পারে, সেই পরিমিত রক্তে তাহার সহস্র সহস্রটা অবস্থিতি করে। ঐ সকল পদার্থ-মধ্যে শোণ-বিন্দুগুলি অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। একটী ধারাল সূচী লইয়া তদ্দ্বারা অঙ্গুলির অগ্রভাগ অল্প-মাত্র বিদ্ধ করিয়া উহার অগ্র-ভাগে যে রক্ত লাগিয়া আসিবে, তাহা একখানি পরিষ্কৃত ও শুষ্ক কাচ-খণ্ডে রাখ, তাহার পর, অণু-বীক্ষণের কাচের ন্যায় একখানি পাতলা কাচ তাহার উপরিভাগে এরূপে স্থাপিত কর, যে উভয় কাচান্তর্গত শোণিত চাপ্‌টা হইয়া যায়। অনন্তর, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দর্শন করিলে ঐ রক্তে অসংখ্য শোণবিন্দু নিরীক্ষিত হইবে।

শরীরের যে অঙ্গে যে পরিমাণে রক্তসঞ্চার হয়, সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। যদি কোনরূপে কোন অঙ্গে রক্তের গতি রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কিয়ৎকাল পরেই সেই অঙ্গ শুষ্ক হইতে দেখা যায়। সেই প্রকার কোন অঙ্গে অপরাপর অঙ্গ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রক্তসঞ্চার হইলে, সেই অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ফলতঃ শরীর পোষণের উপায়ই রক্ত। অতএব, শরীর-মধ্যে রক্ত সঞ্চার নিমিত্ত কয়েক প্রকার বিধান

থাকা নিতান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গে উহার সঞ্চার হওয়া প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ উহার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চার সাধন জন্য বৃহৎ ও সূক্ষ্ম অসংখ্য প্রণালী সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত থাকা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ নিরতিশয় সূক্ষ্ম প্রণালীর মধ্য দিয়া উহার গতি জনন নিমিত্ত বিশেষ বলে উহার চালনা হওয়া চাহি। চতুর্থতঃ শরীর-মধ্যে সঞ্চরণ ও তাহার যেখানে যাহা আবশ্যক সেই স্থলে তাহার সংযোজনা করিয়া উহা পুষ্টিকর পদার্থ শূন্য হয়, এবং শরীরের অনেক দূষিত পদার্থ উহাতে মিলিত হয়, অতএব, যাহাতে উহার সংশোধন ও পুনর্ব্বার উহাতে পুষ্টিকর পদার্থ সংযোজন হয়, তাহার বিধান থাকা আবশ্যক। পঞ্চমতঃ যে পথে শরীর-সঞ্চরণ করিয়া পুষ্টিকর পদার্থ পরিশূন্য ও অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগে দূষিত হয়, পুনর্ব্বার সংশোধন ও পুষ্টিকর পদার্থ সংযোজন জন্য সে পথে উহার গতি হইলে চলে না, এই নিমিত্ত তজ্জন্য পথান্তর থাকা প্রয়োজনীয়। জগন্নিয়ন্তার কৌশলে উহার কোন প্রয়োজনই অসম্পন্ন নাই। উপযুক্ত মতে রক্ত সঞ্চারের জন্য যেরূপ বিধান থাকা আবশ্যক, শরীর-মধ্যে তাহা সকলই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

রক্তের সঞ্চারপথ—রক্তের প্রধান আশ্রয়স্থান,

হৃদয়। হৃদয় চারি অংশে বিভক্ত—উপরিস্থ ভাগ-দ্বয়কে বাম ও দক্ষিণ হৃৎকোষ এবং অধঃস্থ ভাগ-দ্বয়কে বাম ও দক্ষিণ হৃদুদর কহে। হৃদুদর অপেক্ষা হৃৎকোষের আয়তন অল্প। যে সকল প্রণালী দ্বারা রক্ত সঞ্চ-রিত হয়, তাহাদিগকে সামান্যতঃ রক্তবহ নাড়ী কহে। বাম হৃদুদর হইতে একটী বৃহদাকার প্রণালী নির্গত হইয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া, তাহার পর বক্র হইয়া বস্তিদেশ পর্য্যন্ত অবনত হইয়াছে। ঐ বক্র স্থান হইতে নানা শাখা উদ্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী শাখা গলদেশ ও মস্তকে প্রবেশ করি-য়াছে, এবং দুইটী স্কন্ধ দিয়া বাহুতে গমন করিয়াছে। ঐ প্রধান প্রণালীর বস্তিদেশীয় মুখ হইতে আর দুইটী প্রধান শাখা নির্গত হইয়া পদে প্রবেশ করি-য়াছে। ঐ সকল শাখাদিগকে ধমনী কহে। ধমনী সকল বহুল প্রশাখায় পরিণত হইয়াছে, তাহারা আবার অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখায় প্রভিন্ন হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল প্রশাখা-দিগকে কৈশিকা কহে। কৈশিকার সহিত তদাকার নাড়ী-বিশেষের সংযোগ আছে, তাহা-দিগকে শিরা কহে। শিরা যে স্থানে কৈশিকার সহিত সংযুক্ত তাহাই শিরার প্রারম্ভ স্থল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল ক্রমশঃ মিলিত হইয়া যত হৃদয়ের

দিকে আসিয়াছে, ততই বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। শরীরব্যাপ্ত সমুদায় শিরা ক্রমশঃ মিলিত ও দুইটী বৃহৎশিরায় পরিণত হইয়া দক্ষিণ হৃৎকোষের সহিত মিলিত হইয়াছে। শিরার সহিত দক্ষিণ হৃৎকোষের মিলনের পূর্ব্বে উহার সহিত লসীকাবহ নাড়ীর সং-যোগ হইয়াছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লসীকা-বহ নাড়ী শরীরের সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত আছে। এবং শিরার ন্যায় ঐ সকল নাড়ী ক্রমশঃ মিলিত হইয়া বৃহন্নাড়ীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। লসীকাবহ বৃহন্নাড়ীর সহিত দক্ষিণ হৃৎকোষের নিকট শিরার সংযোগ আছে।

শিরা ক্ষত হইলে শীঘ্র শুষ্ক হয়, কিন্তু ধমনী ক্ষত হইলে সহজে তাহার শান্তি হয় না, এই জন্য, শিরা-সকল শরীরের উপরিভাগে যেরূপ ভাসমান আছে, ধমনী সেরূপে অবস্থিত নাই; উহারা অপেক্ষাকৃত অন্তর্নিবেশিত আছে। অপিচ, যেখানে রক্তবহ নাড়ী সন্ধিস্থল দিয়া গমন করিয়াছে, সে স্থলে ধমনী সকল সন্ধিবন্ধনের মধ্যদিয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ শোণিত ধমনী-পথে সঞ্চরিত হয়; ধমনী হইতে উহা কৈশিকায় গমন করিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হয়। কৈশিকা-মধ্যদিয়া সঞ্চরণ-কালেই রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ শরীরলগ্ন হয়। অনন্তর পুষ্টিকর পদার্থ পরিশূন্য হইয়া শিরাপথে দক্ষিণ

হৃৎকোষে উপস্থিত হয়। ধমনী ও শিরা হইতে কৈশিকার তাদৃশ কোন সীমাভেদ নাই, উহা ধমনীর সূক্ষ্ম শাখা মাত্র; উহার মধ্যদিয়া সঞ্চরণকালে শোণিতের শরীর-পোষণ-ক্রিয়া বিশেষরূপে সাধিত হয়, এই কার্য্যগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত শারীরবিৎ পণ্ডিতেরা উহার স্বতন্ত্র নাম কল্পনা করিয়াছেন।

দক্ষিণ হৃদুদর হইতে দুইটী রক্তবহ নাড়ী নির্গত হইয়া ফুস্‌ফুসে মিলিত হইয়াছে—ইহাদিগকে ফুস্‌ফুসীয় ধমনী কহে। ফুস্‌ফুসের গাত্রে অসঙ্খ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহ নাড়ী আছে—তাহাদিগকে ফুস্‌ফুসীয় কৈশিকা কহে। ফুস্‌ফুস হইতেও চারিটী নাড়ী বাম হৃৎকোষে গমন করিয়াছে—তাহাদিগকে ফুস্‌ফুসীয় শিরা কহে। দেহভ্রান্ত শিরানীত দক্ষিণ হৃদুদরস্থ রক্ত ফুস্‌ফুসীয় ধমনীদ্বারা ফুস্‌ফুসে গমন করে, এবং তত্রত্য কৈশিকা মধ্যে সংশোধিত হইয়া ফুস্‌ফুসীয় শিরাদ্বারা বাম হৃৎকোষে যায়।

রক্তের সঞ্চার-পথের মধ্যে মধ্যে কপাট আছে। ঐ সকল কপাট, যে অভিমুখে রক্তের গতি হওয়া উচিত, সেই অভিমুখে গমনকালেই মুক্ত হইয়া শোণিতকে পথ প্রদান করে, কোন ক্রমে উল্টিয়া আসিতে দেয় না। তাহাতেই শরীরের ভিন্ন ভাগস্থ ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত রক্ত পরস্পর মিলিত হইতে পারে না।

হৃদয়ের সঞ্চালন---হৃদয়ে কতকগুলি পেশী নিবদ্ধ আছে। ঐ সকল পেশী সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়ের চালনা সম্পাদন করে। উভয় হৃৎকোষ ও হৃদুদরের পেশী সমান বলে সঙ্কুচিত হয় না। বাম হৃৎকোষ ও হৃদুদরস্থ পেশী-বলে সমুদায় শরীরে রক্তের গতি সাধিত হয়, এবং দক্ষিণ হৃৎকোষে ও হৃদুদরের পেশী-বলে কেবল ফুস্ফুসে রক্ত-সঞ্চার হয়, এই হেতু দক্ষিণ হৃৎকোষ ও হৃদুদর অপেক্ষা বাম-হৃৎকোষ ও হৃদুদরের পেশী-বল অধিক।

তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, হৃদয়ের পেশী অবিরত সঙ্কুচিত হয় না, একবার সঙ্কোচনের পর উহার ক্ষণকাল বিরতি হয়। ঐ বিরতি কাল সঙ্কোচন কাল অপেক্ষা দ্বিগুণ। এই প্রযুক্তই দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্থ পেশী অশীতি বা শত বৎসরাত্মক কাল সঙ্কুচিত হইয়াও অকর্ম্মণ্য হয় না। বক্ষঃস্থলে হস্তস্পর্শ করিলে হৃদয়ের একপ্রকার শব্দ অনুভব হয়। ঐরূপ শব্দ হওয়ার বিশেষ বিবরণ অদ্যাপি সম্যক্ অবধারিত হয় নাই। যাহাহউক, অনুমিত হইয়াছে, হৃদয়ের উপরিভাগ নিশ্চল; ও অধোভাগ কিছুতেই বদ্ধ নহে, ঐ অধোভাগের একবার সম্মুখদিকে এবং একবার পশ্চাৎ দিকে গতি হয় বলিয়া ঐরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

রক্তের গতি—বাম হৃদ্দর হইতে যে প্রধান রক্ত-বহ নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে, হৃদয়স্থ পেশী-বলে প্রথমতঃ তাহাতেই রক্ত প্রবিষ্ট হয়! তাহার পর ধমনী ও কৈশিকা দিয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়। ধমনী-পথে রক্তের গতি সাধন জন্য ঐ সকল নাড়ী স্থিতিস্থাপকতা ও সঙ্কোচ্যতা শক্তি বিশিষ্ট হইয়াছে। ঐ শক্তি থাকাতে হৃদয়নির্গত রক্তের প্রবাহ-বলে ধামনিক রন্ধ্র প্রথম বিস্তৃত ও তৎপরে সঙ্কুচিত হইয়া রক্তের গতি-সাধন করিতে থাকে। আমাদিগের দেশের চিকিৎসকেরা নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া যে রোগ নির্ণয় করেন, তাহা হৃদ্দরের সঙ্কোচন ও প্রসারণ কালে যে ধমনীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয়, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে বায়ু পিত্ত কফের নির্ণয় করা ভ্রমাত্মক মাত্র। ধমনী অপেক্ষা শিরার স্থিতিস্থাপকতা ও সঙ্কোচ্যতা গুণ অল্প। যদি কোন শিরাকে অল্পক্ষণ মাত্র বিস্তারিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করে, কিন্তু দীর্ঘ কাল বিস্তারিত করিয়া রাখিলে, উহার আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি হয় না। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের শরীরের শিরার ঐরূপ বিস্তৃতিভাব বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ধমনী-পথে যেরূপ বেগে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহা পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে। বাম হৃদ্দর-

হইতে যে প্রধান রক্তবহ নাড়ী নির্গত হইয়াছে, তাহার কোন স্থানে ছিদ্র করিয়া একটী পারদ-বিশিষ্ট পরিমাণ-যন্ত্র প্রবেশিত করিয়া দিলে, তত্রত্য রক্তের বেগে ঐ যন্ত্রের পারদ ৬ ইঞ্চ ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। ধমনীতে রক্ত যেরূপ বেগে প্রবাহিত হয়, শিরায় সেরূপ বেগ দেখা যায় না। শিরার রক্তবেগে ঐরূপ যন্ত্রের পারদ $\frac{৩}{১০}$ ইঞ্চ মাত্র ঊর্দ্ধগত হয়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, হৃদয়স্থ পেশী সঙ্কোচন অবিরত নহে। উহা একবার সঙ্কুচিত ও তৎপরক্ষণে বিস্তারিত হয়, অতএব, বোধ হইতে পারে, রক্ত অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে না গিয়া ছিন্ন প্রবাহে গমন করে, বস্তুতঃ তাহা নহে। রক্ত অবিচ্ছিন্ন প্রবাহেই গমন করিয়া থাকে, কিন্তু সেই প্রবাহ সমবেগ-বিশিষ্ট নহে, হৃদয়ের পেশীর সঙ্কোচন প্রসারণে কখন রক্তের বর্দ্ধমান গতি কখন হ্রসমান গতি* হইয়া থাকে।

ধমনীপথে যেরূপ বেগে রক্ত-সঞ্চরণ করে, কৈশিকায় উহার সেরূপ বেগ থাকে না। এরূপ হইবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, কৈশিকা দিয়া রক্তসঞ্চারকালে রক্তের পুষ্টিকর পদার্থ শরীরলগ্ন হইতে থাকে,

* যে গতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে বর্দ্ধমান গতি এবং যে গতি ক্রমশঃ হ্রস্ব হয় তাহাকে হ্রসমান গতি কহে।

এই হেতু, তথায় উহার মৃদু গতি হওয়ায় তৎকার্য্য সম্পন্নের উপযুক্ত সময় লব্ধ হয়।

হৃদয়ের প্রত্যেক সংকোচনে যৎপরিমিত রক্ত হৃদয় হইতে ধমনীতে গমন করে, ধমনীহইতেও সেই পরিমিত রক্ত কৈশিকায় প্রবিষ্ট হয়। শরীরব্যাপ্ত অসংখ্য কৈশিকায় ঐ রক্ত সঞ্চালিত হয়; এই হেতু, কোন কোন কারণে কোন কোন কৈশিকায় রক্তসঞ্চারের ব্যাঘাত জন্মিলে অপরাপর কৈশিকায় অধিক পরিমিত রক্ত প্রবিষ্ট হয়। আমাদিগের মনোমধ্যে ক্রোধ, ভয় ও লজ্জা প্রভৃতির উদ্রেক হইলে কোন কোন কৈশিকা সঙ্কুচিত হইয়া তন্মধ্যে রক্তের গতি রোধ করে; সুতরাং সেই রক্ত কৈশিকান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই হেতু বশতই ক্রোধ ও লজ্জার সময় গণ্ডস্থলস্থ কৈশিকায় অধিক পরিমাণে রক্ত-সঞ্চার হওয়ায় তৎকালে গণ্ডস্থলের লোহিতত্ব জন্মে এবং ভীত ও ভগ্নাশ হইলে তাহাতে রক্তের গতি নিরুদ্ধ হওয়ায় মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ হয়।

পরীক্ষা করিয়া রক্তের গতি দেখা যাইতে পারে একটী উজ্জ্বল আলোকের উপরিভাগে জীবিত ভেকের জিহ্বা রাখিয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে সেই জিহ্বাস্থ ধমনী ও শিরার মধ্যে রক্তের গতি অনায়াসে নিরীক্ষণ করাযায়।

রক্তের কার্য্য—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, রক্ত হইতে আমাদিগের শরীর পোষিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়। রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ শরীরলগ্ন হইয়া, যে ভাগের ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা পরিপূরণ এবং শিশুদেহের সম্বর্দ্ধন করে। কৈশিকামধ্যে সঞ্চরণকালে রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ শরীরে সংযুক্ত হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে রক্তের শোণবিন্দুগুলি ক্রমে ক্রমে মস্তুতে মিলিত হইয়া কৈশিকার গাত্রাভ্যন্তর দিয়া নিসৃত হয়; অনন্তর যে অঙ্গে যে পদার্থ সংযোজন আবশ্যক, সেই অঙ্গে সেই পদার্থ সংযোজিত হয়, অবশিষ্ট তরল পদার্থ লসীকারূপে পরিণত হইয়া লসীকা-বহ নাড়ীমধ্যে প্রবেশ করে। যাহা হউক, রক্তের পোষণক্রিয়া কৈশিকা দিয়া সঞ্চরণ কালেই হইয়া থাকে এবং সেই সময়ে শরীরস্থ অনেক দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত সংযুক্ত হয়।

যে অঙ্গ যত সঞ্চালিত হয়, সেই অঙ্গে সেই পরিমাণ রক্তসঞ্চার হইয়া থাকে, এবং সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। এই জন্যই নর্ত্তকদিগের পদ ও জঙ্ঘা প্রভৃতির পেশী এবং কর্ম্মকরদিগের স্কন্ধ ও বাহুস্থ পেশী অন্যান্য অঙ্গের পেশী অপেক্ষা সবল হয়।

শরীরের অঙ্গ বিশেষ সঞ্চালন দ্বারা কেবল সঞ্চা-

লিত অঙ্গেরই উপকার হয়, এমত নহে, তদ্দ্বারা অন্যান্য অঙ্গেরও ভূয়িষ্ঠ উপকার হয়। সঞ্চালিত অঙ্গে রক্ত সতেজে গমন করাতে সমুদায় শরীরের রক্ত-প্রবাহ সতেজ হইয়া শরীরের যে যে কার্য্য দ্বারা রক্ত উৎপন্ন হয় তাহারও সতেজস্কতা সম্পাদন করে। শিশুরা সর্ব্বদা ধাবন ও কূর্দ্দন করে, তাহাতে তাঁহাদিগের শরীরে সমধিক বেগে রক্ত সঞ্চার হইতে থাকে। তাহাদিগের শরীরে যেরূপ সতেজে রক্ত সঞ্চার হয়, সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র রক্তস্থ পুষ্টি-কর পদার্থ—তাহাদিগের শরীরে যোজিত হয়, সুতরাং তত শীঘ্র শীঘ্র আবার রক্তে পুষ্টিকর পদার্থ সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়াও নিশ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা রক্তের পোষণী শক্তি জন্মে, সুতরাং তাহাদিগের পরিপাক-ক্রিয়া ও নিশ্বাস-ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই নিমিত্তই শিশুদিগের সর্ব্বদা ক্ষুদ্বোধ হয়, এবং এই কারণেই তাহাদিগের শরীর সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

রক্তের সংশোধন ও তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থের সংযোগ—কৈশিকা-মধ্যদিয়া গমনকালে রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ শরীরলগ্ন হইয়া ও শরীরের দূষিত পদার্থ রক্তে মিলিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে উহার বর্ণেরও ব্যত্যয় হয়, উহার উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের

অভাব হইয়া কিঞ্চিৎ কালিমা-বিশিষ্টতা জন্মে। সেই অবস্থায় উহার সংশোধন এবং উহাতে পুনর্ব্বার পুষ্টিকর পদার্থের সংযোজন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সেই প্রয়োজন সাধন জন্য উহা শিরা-পথে দক্ষিণ হৃৎকোষে আগমন করে। শিরা-পথে দক্ষিণ-হৃৎকোষে আগমন করিবার পূর্ব্বে উহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ রসের সহিত মিলিত হয়। ঐ শ্বেতবর্ণ রস লসীকা ও অন্নরসের সংযোগে উৎপন্ন। লসীকা জলের ন্যায় তরল, বর্ণহীন ও স্বচ্ছ, এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া তাহা হইতে যে রস জন্মে, তাহাই অন্নরস নামে খ্যাত। অন্নরস দুগ্ধের ন্যায় অস্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ। লসীকাবহ নাড়ীর সহিত অন্নরসবাহিনী অসংখ্য শোষণী নাড়ীর সংযোগ আছে। ঐ সকল শোষণী নাড়ী পাকাশয়ের গাত্রে সংলগ্ন আছে, তদ্দ্বারা পাকাশয় হইতে অন্নরস শোষিত হইয়া লসীকাবহ নাড়ী-মধ্যে প্রবাহিত হয়। অনন্তর, ঐ অন্নরস-যুক্ত লসীকা, তদ্বহ নাড়ী দ্বারা দক্ষিণ-হৃৎকোষের নিকট শিরাস্থ রক্তের সহিত মিলিত হয়, তাহাতেই রক্তে পুষ্টিকর পদার্থের সংযোগ হয়।

রক্ত, শিরাপথে দক্ষিণ-হৃৎকোষে প্রবিষ্ট হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ হৃদুদরে এবং সেই স্থল হইতে

ফুস্ফুসীয় ধমনী দ্বারা ফুস্ফুসে গমন করে। ফুস্ফুসে উপস্থিত হইলে উহার সম্যক্ পরিশোধন হয়। নিশ্বসিত বায়ুর সংযোগে রক্তস্থ দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়, উহার বর্ণ পুনর্ব্বার উজ্জ্বল লোহিত হয়, এবং পুনর্ব্বার শরীর পোষণোপযোগী হইয়া ফুস্ফুসীয় শিরা দ্বারা বাম-হৃৎকোষে গমন করে। অনন্তর, উহা বাম-হৃৎকোষ হইতে বাম হৃদুদরে উপস্থিত হয়, তথা হইতে পুনর্ব্বার ধমনী পথে সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হয়। এই রূপে শোণিত বারম্বার শরীর-মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া শরীর রক্ষা করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্বাসক্রিয়া।

পৃথিবীতে আগমন করিয়া আমাদিগের প্রথম কার্য্য নিশ্বাস গ্রহণ, ও পৃথিবী ত্যাগ-কালে শেষ কার্য্য প্রশ্বাস ত্যাগ *। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদিগের

* শ্বাস ক্রিয়ায় দ্বিবিধ কার্য্য হইয়া থাকে। এক প্রকার দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু শরীরস্থ হয়; অন্য প্রকার দ্বারা শরীরস্থ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। যে ক্রিয়া দ্বারা বাহ্য বায়ু শরীরে প্রবেশ করে, সচরাচর লোকে তাহাকে নিশ্বাস গ্রহণ বলে, এই প্রযুক্ত তাহাকে নিশ্বাসক্রিয়া ও অন্য প্রকারকে প্রশ্বাস ক্রিয়া শব্দে নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

জীবন রক্ষার মূল, তদভাবে আমরা ক্ষণকালও জীবিত থাকি না। দেহ-ভ্রান্ত বিবর্ণ দূষিত শোণিত ফুস্ফুসে উপস্থিত হইয়া ইহা দ্বারা সংশোধিত হয়, এবং আমাদিগের শরীরে সর্ব্বক্ষণ যে উত্তাপ বিদ্যমান থাকে, ইহাই তাহার কারণ।

শ্বাসযন্ত্র—ফুস্ফুস, কণ্ঠনালী, এবং তদানুষঙ্গিক পেশা-নিচয় আমাদিগের শ্বাসক্রিয়ার প্রধান যন্ত্র।

ফুস্ফুস কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষ পূর্ণ। উহা দুই ভাগে বিভক্ত—একভাগকে বাম ফুস্ফুস, ও অন্য-ভাগকে দক্ষিণ ফুস্ফুস কহে। গলদেশের উপরিভাগ হইতে অবনমিত হইয়া একটী নলাকার প্রণালী তৃতীয় গ্রীবা-কশেরুকার সমীপবর্ত্তী স্থানে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুই ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রণালীকে কণ্ঠনালী কহে। কণ্ঠনালীর শাখা-দ্বয় ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়া অসঙ্খ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদায় ফুস্ফুসে ব্যাপ্ত, এবং তাহাদিগের এক একটী এক এক বায়ুকোষে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ সকল বায়ুকোষের যে মুখ কণ্ঠনালীর সূক্ষ্ম শাখায় মিলিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর মুখ অবরুদ্ধ। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির ফুস্ফুসে ঐ সকল সূক্ষ্ম শাখার পরিমাণ এক ইঞ্চির ত্রিংশৎ হইতে পঞ্চাশৎ ভাগের ভাগ

এবং বায়ুকোষের পরিমাণ এক ইঞ্চির সপ্ততি হইতে দুইশত ভাগের ভাগ হইবে।

পঞ্জরের গঠন বিবরণ প্রথমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ফুস্ফুস অবস্থিত আছে। ফুস্ফুসের উপরিভাগ পঞ্জরের অন্তর্দ্দেশের সহিত তুল্যাকার; এবং ফুস্ফুস পঞ্জরের গাত্রলগ্ন হইয়া আছে। পঞ্জ-রের পর্শুকাগুলি পরস্পর পেশী দ্বারা সংযুক্ত, এবং উহার অধোভাগে একখানি প্রায় অর্দ্ধ গোলাকার পেশী সংযুক্ত আছে। ঐ পেশীর গোল ভাগ উপ-রের দিকে সংস্থিত। উহা সম্মুখদিকে বক্ষাস্থির সহিত, পশ্চাৎদিকে কশেরুকায় ও পার্শ্বদিকে পর্শুকায় নিবদ্ধ। ঐ পেশী পঞ্জরের প্রায় অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া আছে। উহার দ্বারা মধ্যকায় দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উপরিস্থ অংশকে বক্ষঃ-স্থল এবং অধঃস্থ অংশকে উদর কহে। ঐ পেশী উদরের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিয়া আছে বলিয়া উহাকে উদরবিতান নামে নির্দ্দেশ করা গেল।

শ্বাসক্রিয়া—বহিঃস্থ বায়ু নাসারন্ধ্র ও মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া কণ্ঠনালী দ্বারা ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট হয়। তথায় গিয়া উহার কোন প্রকার চালনা হয় না। তত্রত্য বায়ুকোষের অবরুদ্ধ মুখ উহার গতি নিরোধ করে। সুতরাং উহার বেগে বায়ুকোষ সমুদায়

স্ফীত হইয়া উঠে। ঐ বায়ু যখন বহির্গত হইয়া যায়, তখন ঐ সকল কোষ সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু বায়ু-কোষস্থ সমুদায় বায়ু এককালে বহির্গমন করে না। বিশেষ বল দ্বারা প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেও কিয়ৎ পরিমিত বায়ু কোষাভ্যন্তরে রহিয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ফুস্ফুস সম্পূর্ণ রূপে স্ফীত হইলে তাহাতে ৩০০ ঘন ইঞ্চ পরিমিত বায়ু থাকে। শ্বাস ক্রিয়া দ্বারা গড়ে প্রতিবার ৩০ ঘন ইঞ্চ বায়ু বহির্গত হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রশ্বাস ত্যাগের পরও ২৭০ ঘন ইঞ্চ পরিমিত বায়ু ফুস্ফুসে থাকিয়া যায়, সুতরাং তৎকালে ফুস্ফুসের সম্পূর্ণ সঙ্কোচ হয় না।

যে অবস্থায় আমরা শারীরিক শ্রম-সাধ্য কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকি, তখন কেবল উদর-বিতানের উন্নতি, অবনতি ও পর্শুকা-চয়ের অল্পমাত্র উন্নমনাবনমন দ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। যখন উদর-বিতান অবনমিত হয়, তখন উদরস্থ আমাশয় অন্ত্র-প্রভৃতি উদর-বিতান দ্বারা নিপীড়িত হওয়ায় সম্মুখ ও পার্শ্ব দিকে, স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতেই পঞ্জরের আয়তন-বৃদ্ধি ও উদরের আয়তন হ্রস্ব হয়। প্রশ্বাস ত্যাগ কালে উদর-বিতানের উন্নতি হইলে উদরের উপরিভাগে বাহ্য বায়ু নিপীড়ন করাতে এবং উদরা-

বরণের স্থিতিস্থাপকতা গুণ প্রযুক্ত আমাশয় অন্ত্র প্রভৃতি পশ্চাৎ ও ঊর্দ্ধ দিকে সরিয়া যায়। এই রূপে শ্বাসক্রিয়া-কালে উদরের স্ফীতি ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে। শরীর ও মনের সুস্থিরতাবস্থায় এই প্রকারে শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, কিন্তু চঞ্চলতাবস্থায় শ্বাসক্রিয়া-কালে বক্ষঃস্থলের ও পৃষ্ঠদেশীয় সমুদায় পেশীর কার্য্য হইয়া থাকে।

শ্বসিত বায়ু—বাহ্য বায়ু যখন নির্ম্মল থাকে তখন তাহাতে দুইপ্রকার বায়বীয় পদার্থ থাকে—একটীকে যবক্ষারজান এবং অপরটীকে অম্লজান কহে। ১০০ ঘন ইঞ্চ্-পরিমিত নির্ম্মল বাহ্যবায়ুতে ৭৯.১০ যবক্ষারজান ও ২০.৯০ অম্লজান বায়ু থাকে। প্রশ্বাস ত্যাগে যে বায়ু বহির্গত হইয়া যায়, তাহার ১০০ ঘন ইঞ্চ্-পরিমিত বায়ুতে ১৬.০৩ ঘন ইঞ্চ্ অম্লজান ও ৪.২৬ ঘন ইঞ্চ্ দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বায়ু থাকে। নিশ্বাসগ্রহণে যে বায়ু শরীরস্থ হয়, তাহাতে ঐ ৪.২৬ ঘন ইঞ্চ্ দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বায়ু থাকে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, ফুস্ফুসে ১০০ ঘনইঞ্চ্ পরিমিত বায়ুর ৪.৮৭ ঘনইঞ্চ্ অম্লজান বায়ু অপগত হইয়া উহা ৪.২৬ ঘনইঞ্চ্ দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বায়ু বিশিষ্ট হয়।

রসায়ন-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, অঙ্গার ও অম্লজান বায়ুর রাসায়নিক সংযোগে দ্ব্যম্ল

অঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন হয়; এবং ঐ বায়ুর যে আয়তন তাহাতে তত্তুল্যায়ত অম্লজান বায়ু থাকে। তাহা হইলেই প্রশ্বসিত ৪.২৬ দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ুর সহযোগে ৪.২৬ অম্লজান বায়ু নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, কেবল 0.৬১ ঘনইঞ্চ্ পরিমিত অম্লজান বায়ু ফুস্ফুসে থাকিয়া যায়। কিন্তু নিশ্বসিত বায়ুতে যে পরিমাণের জলীয় বাস্প থাকে, প্রশ্বসিত বায়ুতে তদপেক্ষা অধিক পরিমিত জলীয় বাস্প দেখা যায়। কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণবিশেষের অম্লজান ও উদজান বায়ুর মিলনে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব এমত হইতে পারে, ঐ 0.৬১ ঘনইঞ্চ্ অম্লজান বায়ু ফুস্ফুসে উদজান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া জলীয় বাস্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। তাহা হইলে ইহাই স্থির হয়, শ্বাসক্রিয়া দ্বারা কিয়ৎ পরিমিত অঙ্গার ও উদজান বায়ু শরীর হইতে নিষ্কাশিত ও কিয়ৎ পরিমিত অম্লজান বায়ু শরীরস্থ হয়; এবং ঐ অঙ্গার ও উদজান বায়ু স্বাকারে নির্গত না হইয়া অম্লজানের সংযোগে দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু ও জলীয় বাস্পের আকারে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

নিশ্বসিত বায়ুর অম্লজান ভাগ শরীরের কোন্ স্থানে অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন

ভিন্ন মত আছে। কেহ ফুস্ফুস, কেহবা শরীরের রক্তসঞ্চার পথের অপর ভাগ বিশেষকে ঐরূপ ঘটনার স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সে সকল মতের উল্লেখ করা গেল না। যাহাহউক, আমাদিগের শরীরে সর্ব্বদা যে উত্তাপ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বাসক্রিয়া তাহার কারণ। ঐ উত্তাপ শ্বাসক্রিয়া দ্বারা, হয় ফুস্ফুসে না হয় সমুদায় শরীরে জন্মিয়া থাকে এবং নিশ্বসিত বায়ুর ফুস্ফুসীয় কৈশিকাগত রক্তের সহিত যে অম্লজান ও দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ুর বিনিময় হইয়া থাকে, তাহা ঐ উত্তাপ জননের সহকারী কারণ।

প্রতিদিবস পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকর্ত্তৃক ২২ ঘনফুট অম্লজান বায়ু নিশ্বসিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ১৯ ঘন ফুট, দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ুতে পরিণত হইয়া বহির্গত হইয়া যায়; অবশিষ্টও, বোধ হয়, উদজান বায়ুর যোগে বাষ্পাকারে নির্গত হয়। দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ুতে পরিণত হইয়া প্রতিদিবস যত অঙ্গার শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহার পরিমাণ প্রায় পাঁচ ছটাক হইবে।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে প্রতীতি হইবে, নিশ্বসিত বায়ুর অম্লজান ভাগ রক্তের সংস্কার করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করে; সুতরাং ঐ বায়ু

আমাদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত অতীব প্রয়োজনীয়। ইতরেতর জন্তুগণও তদ্দ্বারা জীবিত থাকে। পৃথিবীস্থ জীবসঙ্খ্যা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোধ হইতে পারে, যদি অম্লজান বায়ু উৎপত্তির কোনরূপ উপায় ব্যবস্থাপিত না থাকে, তাহা হইলে অল্প দিবসের মধ্যেই বাহ্য বায়ুর অম্লজান ভাগ নিঃশেষিত ও তাহা অনিষ্টকর দ্বায়ম্ল অঙ্গারক বায়ু পরিপূরিত হইয়া জীবলোকের ধ্বংস সম্পাদন করে। আবার বাহ্য বায়ুতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অম্লজান বায়ুর আধিক্য হইলেও জন্তুগণ জীবিত থাকে না। অধিক পরিমিত অম্লজান বায়ু নিশ্বসিত হইলে একপ্রকার অস্বাস্থ্যজনক মত্ততা জন্মে; এবং অম্লজানের অভাব হইলে যেমন জীবন বিনষ্ট হয়, তদ্দ্বারাও সেইরূপ জীবন নাশ হয়। সুতরাং বাহ্য বায়ুতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অম্লজানের আধিক্য বা অভাব, উভয়ই তুল্যরূপ অহিতকারী। অতএব, যাহাতে বাহ্য বায়ুতে নির্দ্দিষ্ট পরিমিত অম্লজানের আধিক্য নিবারণ ও অভাব বিমোচন হয়; এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক। প্রকৃতিকার্য্যেরও কোন অংশে সামঞ্জস্যের ন্যূনতা নাই। পরম করুণাবান্ পরমেশ্বর আবশ্যক পরিমাণে অম্লজান বায়ু জন্মিবার উপায় বিধান করিয়া সমুদায় আশঙ্কার

পরিহার করিয়াছেন। জন্তুগণের ন্যায় উদ্ভিজ্জদিগে-রও শ্বাসক্রিয়া হইয়া থাকে। উহারা পল্লবদ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে। জন্তুগণ যে পরিমাণে অম্লজান বায়ু গ্রহণ ও দ্বাম্লঅঙ্গারক বায়ু পরিত্যাগ করে, উদ্ভিজ্জগণও সেই পরিমাণে দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ ও অম্লজান বায়ু পরিত্যাগ করে। তাহাতেই বাহ্যবায়ুতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অম্লজান বায়ুর স্থিতির ব্যতিক্রম হয় না।

উদ্ভিজ্জগণ সকল সময়ে অম্লজান বায়ু পরিত্যাগ ও দ্বাম্লঅঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করে না। দিবাভাগে তাহাদিগের গাত্রে আলোক লাগিলে উহারা অম্লজান পরিত্যাগ ও দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করে; রাত্রি-কালে উহাদিগের গাত্র আলোকস্পৃষ্ট হয় না, তখন উহারা দ্বাম্লঅঙ্গারক বায়ু পরিত্যাগ ও অম্লজান বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু উহারা দিবাভাগে যে পরিমাণে দ্বাম্লঅঙ্গারক বায়ু গ্রহণ ও অম্লজান পরি-ত্যাগ করে, রাত্রিকালে সে পরিমাণে অম্লজান বায়ু গ্রহণ ও দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু পরিত্যাগ করে না। তাহাদিগের ঐ ক্রিয়া এরূপে নিষ্পন্ন হয় যে, বাহ্য বায়ুতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অম্লজানের অভাব বা আধিক্য হয় না।

দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু আমাদিগের জীবনের পক্ষে

অত্যন্ত অনিষ্টকারী। অতএব, রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে থাকিলে কিম্বা সুগন্ধ সেবনজন্য গৃহমধ্যে কুসুমিতা লতাদি রক্ষা করিলে অথবা পুষ্পঘ্রাণ লইলে আমাদিগের স্বাস্থ্যনাশ হইতে পারে। কিন্তু দিবাভাগে তদ্রূপ ঘটনার আশঙ্কা নাই; বরং তৎকালে তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার আনুকূল্য হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা আমাদিগের প্রাচীন মনুপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র-লিখিত "রাত্রৌচ বৃক্ষমূলানি দূরতঃপরিবর্জ্জয়েৎ" এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষা পাইতেছে।

শ্বাসক্রিয়ার রূপান্তর—শ্বাসক্রিয়ার উপর শরীর গত অনেক কার্য্য নির্ভর করে। বমন, মলত্যাগ, পান, শব্দোচ্চারণ, গীতক্রিয়া, ক্ষুৎ, জৃম্ভণ, রোদন, হাস্য, হিক্কা, নিষ্ঠীবনত্যাগ, নাসাধ্বনি, কাসি, বায়ু-উদ্গীরণ, শিঙ্ঘাণকত্যাগ প্রভৃতি শ্বাসক্রিয়ার রূপান্তর বিশেষে ঘটিয়া থাকে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক পঞ্জরমধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার বেগে এবং উদর বিতানের ও উদরগত পেশী সমূহের সঙ্কোচনদ্বারা আমাশয় হইতে ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরিত হয়। মলত্যাগেও অন্ত্রের উপর ঐরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

কণ্ঠনালীদ্বারা বায়ু নির্গমনকালে যন্ত্রবিশেষে সংলগ্ন হইয়া স্বরের উৎপত্তি হয়। গান স্বরোচ্চারণের প্রকার

আমাদিগের মন কোন প্রকার প্রগাঢ় চিন্তায় ব্যাসক্ত হইলে অল্পে অল্পে বায়ু নিশ্বসিত হইয়া সমধিক বলে নির্গত হইয়া যায়। তাহাকেই দীর্ঘশ্বাস কহে।

অধঃস্থ চোয়ালের পেশী সহসা সঙ্কুচিত হইয়া যে বায়ু নিশ্বসিত হইতে থাকে, তাহাতেই জৃম্ভণক্রিয়া হয়।

উদরবিতানের সঙ্কোচন প্রভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া কতকগুলি প্রশ্বাসক্রিয়া হইলেই হাস্য হইয়া থাকে।

নাসা পেশী সঙ্কুচিত হইয়া সমধিক বেগে বায়ু নিশ্বসিত ও পরক্ষণে বিশেষ বলে নির্গত হইলে ক্ষুৎ-ক্রিয়া হয়। নিষ্ঠীবন ত্যাগ, বায়ু উদ্গীরণ, নাসা-ধ্বনি, কাসি প্রভৃতি ক্রিয়াও শ্বাসক্রিয়ার প্রকার-ভেদদ্বারা ঘটিয়া থাকে।

চর্ম্মগত শ্বাস—প্রধানতঃ মুখ, নাসা, কণ্ঠনালী, ফুস্ফুস প্রভৃতি দ্বারা শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। চর্ম্মের দ্বারাও কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্য বায়ু শরীরস্থ হয় এবং শরীরস্থ দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু ফুস্ফুস, অপেক্ষা চর্ম্মের সচ্ছিদ্রতা অল্প বলিয়া তদ্দ্বারা অতিঅল্পমাত্র বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত সংস্কার করে। চর্ম্মগত পথে যে পরিমিত অম্ল-

জান বায়ু শরীরস্থ হয়, এবং দ্যূষিত অঙ্গারক বায়ু শরীর হইতে নিষ্কাশিত হয়, তাহাতে রক্তের সম্যক পরিশোধন হয় না। রক্তের সম্পূর্ণ সংস্করণ কেবল ফুস্ফুসেই হইয়া থাকে। ধমনী অপেক্ষা শিরা শরীরের উপরিভাগে ভাসমান ও তাহাতে রক্তের বেগ ন্যূন বলিয়া চর্ম্মগত শ্বাসক্রিয়া দ্বারা শিরাস্থ রক্তের সহিত বাহ্য বায়ুর সহজে সংস্পর্শ হইতে পারে, এবং দীর্ঘকাল তাহার পরিশোধন হয়।

নিতান্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে চর্ম্ম-পথে শরীর-মধ্যে বায়ু প্রবেশ ও শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নির্গমের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এই জন্য তাদৃশ বস্ত্র পরিধান করিলে পীড়া হইয়া থাকে।

প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত স্থানে বাসের আবশ্যকতা—পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিঘণ্টায় ৩৫০ ঘন ফিট্ নির্ম্মল বায়ু আবশ্যক। ইহার অভাব হইলেই আমাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা। সঙ্কীর্ণ বা জনাকীর্ণ স্থানে থাকিলে এই কল্যাণকর নিয়ম অপালিত হয়। শ্বাসক্রিয়াদ্বারা ও চর্ম্মপথে আমাদিগের শরীর হইতে অনবরতই অনিষ্টকর পদার্থ সকল বহির্গত হইতেছে। অনাবৃত বা প্রশস্ত স্থানে থাকিলে সেই সকল পদার্থ বাহ্যবায়ুতে বিস্তৃত [illegible]

হইয়া যায়, তাহাতে আমাদিগের কোন প্রকার অপকার হইতে পারে না, এবং নির্ম্মল বাহ্যবায়ু শরীরস্থ হইয়া রক্তের পরিশোধন করে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ বা জনাকীর্ণ স্থানে থাকিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাদৃশ স্থানে শরীর-নিঃসৃত অপকারী পদার্থের বাহুল্য হয়, এবং প্রশ্বাসক্রিয়া দ্বারা সেই সকল পদার্থ শরীরস্থ হইয়া স্বাস্থ্যনাশ করে।

দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদিগের দেশের অতি অল্প লোকের প্রশস্ত স্থানে বাস ও নির্ম্মল বায়ু সেবন ঘটিয়া থাকে। যাঁহাদিগের স্থানের প্রাশস্ত্য আছে, চতুর্দ্দিক্ অপরিষ্কৃত প্রযুক্ত তাঁহাদিগেরও নির্ম্মল বায়ু-সেবনের সম্যক্ প্রতিবন্ধকতা হয়, সুতরাং প্রশস্ত স্থানে বাস করা না করা তাঁহাদিগের পক্ষে তুল্য হইয়া থাকে। নগর-নিবাসী এতদ্দেশীয় লোকের বাটীর চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধময় পয়ঃ-প্রণালী, পুরীষগন্ধ, মূত্রদূষিত স্থান বা আবর্জ্জনা-রাশি এবং পল্লীগ্রাম-বাসীর ভবনের চতুষ্পার্শ্বে দুর্গন্ধময় গর্ত্ত, অপরিষ্কৃত বন, পূতিগন্ধিক পুষ্করিণী বা পয়োনালী দেখিতে পাওয়া যায় না, এমত বাটী অতি বিরল। সুতরাং তাদৃশ স্থানে বাস করিয়া আমাদিগের দেশীয় লোক রুগ্ন ও ভগ্ন হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? আবার এ দেশস্থ অনেক লোকেই গৃহদ্বার ও গবাক্ষাদি অপ্রশস্ত করিয়া

থাকেন। কোন কোন গৃহে একটী দ্বারের অধিক রন্ধ্রমাত্র লক্ষিত হয় না। সেরূপ গৃহে না নির্ম্মল বায়ুসঞ্চার হইতে পারে, না তদ্বাসী ব্যক্তিদিগের শরীরনির্গত দুষ্ট পদার্থ গৃহ হইতে অপসারিত হইতে পারে। তাহাতে আবার সেই গৃহ-মধ্যে বা তাহার দ্বার-দেশে আবর্জ্জনা থাকিলে অনিষ্টোৎপাদনের পথ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত স্থানে বাস যেমন অনিষ্টকর, জনতা-স্থলেও অবস্থান তাদৃশ অকল্যাণ-কারী। বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে, আমাদিগের শরীর হইতে প্রশ্বসিত বায়ু সহযোগে ও চর্ম্মপথে নিয়তই অনিষ্টকর পদার্থ সকল বহির্গত হইতেছে। জনতা স্থলে এককালে বহু লোকের শরীর হইতে ঐ সকল দুষ্ট পদার্থ নির্গত হওয়ায় তত্রত্য বায়ু দূষিত হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা ও উপরিভাগে চন্দ্রাতপ দ্বারা অবরুদ্ধ বাটী নৃত্যগীতাদি মহোৎসব উপলক্ষে জনাকীর্ণ হইলে, তত্রত্য বায়ু বিষবৎ হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে পূজা বা অন্য ক্রিয়া উপলক্ষে তাদৃশ স্থানে বসিয়া সমুদায় নিশা যাপন করিবার যে কুপ্রথা আছে, তাহা কতদূর ভয়াবহ, এতদ্দ্বারা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। সেরূপ স্থল কেবল প্রশ্বসিত বা চর্ম্মপথে বহির্গত বায়ুস্থ অনিষ্টকর

পদার্থ দ্বারা দূষিত হয়, এমত নহে, পথান্তর অবলম্বন করিয়া যে সকল অনিষ্টকর পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হয় তদ্দ্বারা তত্রত্য বায়ুর দোষ প্রাপ্তির চরম সীমা উপস্থিত হয়।

শ্বাস ক্রিয়ার সহিত শরীর সঞ্চালনের সম্বন্ধ— শরীর-সঞ্চালনের সহিত শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অলস ও কার্য্য-মৃদু জন্তু অপেক্ষা পরিশ্রমী ও কার্য্য-সত্বর জন্তুগণের শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা অধিক পরিমিত বায়ু শরীরস্থ হয়। মধুমক্ষিকা ও প্রজাপতি অপেক্ষা ভেকের শরীর শতগুণ অধিক হইলেও তাহাদিগের অপেক্ষা উহার শরীরে অল্প পরিমিত বায়ু নিশ্বসিত হইয়া থাকে। পরিশ্রমী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অলস-দিগের শ্বাসক্রিয়া অল্প হয়, সুতরাং অল্পপরিমিত অম্লজান বায়ু উহাদিগের শরীরস্থ হয়। যখন আমরা দ্রুত গমন করি বা দৌড়াই তখন শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি, কখন কখন তৎকালে এমত অবস্থা হয় যে, শরীরের সেই অবস্থায় যে পরিমিত বায়ু আবশ্যক, আমরা তৎপরিমিত বায়ু গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারি না; তখন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। শরীরের সঞ্চালন, পোষণ, রক্ত সঞ্চারণ ও শ্বাসক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধাধীন এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। শরীর সঞ্চালনের

সঙ্গে সঙ্গেই শরীরস্থ অকর্ম্মণ্য কতক ভাগ শরীর হইতে নিষ্কাশিত হয়, সুতরাং রক্তদ্বারা তাহার পরিপূরণ হওয়া আবশ্যক। রক্তও ঐ ক্ষতি-পূরণ করিয়া পোষণীশক্তি-বিহীন হয়, সুতরাং ভক্ষিত দ্রব্য ও অম্লজান বায়ু হইতে পুনর্ব্বার উহার পোষণী-শক্তি-সম্পন্নতা প্রয়োজনীয়। অতএব, শরীর-সঞ্চালনে রক্তের সতেজ সঞ্চার আবশ্যক হয়, এবং রক্তের সতেজ সঞ্চার হইলেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

শ্বাসক্রিয়ার সহিত ভুক্ত দ্রব্যের সম্বন্ধ—আমাদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিশ্বসিত বায়ুর অম্লজান-ভাগ শরীরস্থ হইয়া যাহাতে দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু ও বাষ্পে পরিণত হয়, তাহার বিধান থাকা আবশ্যক। অতএব ভুক্ত দ্রব্য হইতে যেমন শরীরের সম্বর্দ্ধন ও অপচিত অংশ পরিপূরণ হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ নিশ্বসিত অম্লজান বায়ুর দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু ও বাষ্পে পরিবর্ত্তন জন্য, তাহা হইতে অঙ্গার ও উদজান বায়ু নির্গত হওয়া প্রয়োজনীয়। রক্তস্থ অম্লজান বায়ু দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ুতে পরিবর্ত্তিত হওয়া এমনই আবশ্যক যে, যদি কোন জন্তু উপযুক্ত-পরিমাণের অঙ্গার বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন না করে, তাহা হইলে অম্লজান বায়ুর অতিরিক্ত ভাগ দ্বারা

শরীর হইতেই আবশ্যক-পরিমিত অঙ্গার গৃহীত হয়। অঙ্গার শরীরের একটা উপাদান। অতএব, কিছুকাল ঐ রূপে শরীরের অঙ্গার ক্ষয় পাইলে শরীর নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ ভক্ষিত দ্রব্যে যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত অঙ্গার থাকে, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত ভাগ মেদের আকারে শরীরে সঞ্চিত হইয়া তাহার স্থূলতা সম্পাদন করে। মেদ, প্রধানতঃ উদজান বায়ু ও অঙ্গারের সংযোগে উৎপন্ন হয়। মেদ-সঞ্চয়ের পর যদি এমত দ্রব্য ভক্ষিত হইতে থাকে, যাহাতে আবশ্যক পরিমাণের অঙ্গার ও উদজান বায়ুর ভাগ না থাকে, তাহা হইলে রক্তস্থ অম্লজান বায়ু ক্রমশঃ মেদের অঙ্গার ও উদজান ভাগ গ্রহণ করিয়া তাহার ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে, তখন শরীর কৃশ হইতে থাকে।

জন্তুগণ নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া উত্তমাহার পাইলে স্থূলতনু হয়, ও পরিশ্রমী-ব্যক্তিরা সেরূপ হয় না, তাহার কারণ এই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, নিষ্কর্ম্মাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস অল্পে অল্পে হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের শরীরে অল্প-পরিমিত অম্লজান বায়ু প্রবিষ্ট হয়, ও সেই পরিমাণের অঙ্গার ও উদজান বায়ুর আবশ্যকতা হয়। উত্তমোত্তম ভক্ষ্য দ্রব্যে অধিক পরিমিত অঙ্গার থাকে, অতএব আবশ্যকাতি-

রিক্ত অঙ্গারের ভাগ মেদরূপে শরীরে সঞ্চিত হইয়া শরীরকে স্থূল করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু যেমন উত্তম সামগ্রী ভোজন করা যায়, সেইরূপ যদি সর্ব্বদা শরীর চালনা করা যায়, ব্যায়াম ও পরিশ্রম অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে রক্ত-সঞ্চারের দ্রুততা সম্পাদিত, অধিক পরিমিত বায়ু নিশ্বসিত ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমিত অম্লজান বায়ু রক্তের সহিত মিলিত হয়, সুতরাং সেই পরিমাণের অঙ্গার ও উদজান বায়ুর আবশ্যকতা হওয়ায়, ভক্ষিত দ্রব্যের সমুদায় অঙ্গার ও উদজান ভাগ, অম্লজান-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া মেদ-সঞ্চয়ের ও তজ্জন্য স্থূলতা জন্মিবার ব্যাঘাত উপস্থিত করে। প্রায় সকলেই অবগত আছেন, নিয়মিত রূপে শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করিলে শরীরের স্থূলতা নিবারিত হয়। আমাদিগের দেশে ধন-সম্পন্ন ব্যক্তি-দিগকে যে স্থূলকায় দেখিতে পাওয়া যায়, আলস্য ও খাদ্যের উৎকর্ষ তাহার কারণ। রাণাঘাট-নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী নীলকমল পাল-চৌধুরী ও তাঁহার কতিপয় পুত্র এই বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। শ্রুতি-গোচর আছে, স্থূলতা-নিবন্ধন তাঁহারা এককালে অক-র্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিলেন। শয়ন, উত্থান, উপবেশন, প্রভৃতি ক্রিয়াও তাঁহাদিগের স্বায়ত্ত ছিলনা। ঐ সকল কর্ম্মের জন্য তাঁহাদিগকে ভৃত্যের সহায়তা

লইতে হইত। অবশেষে তাঁহাদিগের অনেকের মেদ রোগে প্রাণত্যাগ হয়। ফলতঃ শরীর সবল ও কর্ম্মঠ রাখিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণের সহিত শারীরিক পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

অতি স্থূলতা নিন্দনীয় হইলেও শরীরে কিয়ৎ-পরিমিত মেদ থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ উহাদ্বারা শরীরের কোমলাংশগুলি আচ্ছাদিত থাকে; দ্বিতীয়তঃ উহা তাদৃশ তাপ-পরিচালক নহে। শরীরের কোমলাংশ গুলি উহাদ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় সহসা ঐ সকল অংশ আহত হইতে পায় না। শরীরের সর্ব্বাবয়বের মধ্যে চক্ষু অতীব প্রয়োজনীয় ও সুকুমার, এই জন্য মেদস্তর-পরিবৃত হইয়া উহা কোটর-বিশেষে সংস্থিত আছে। পদতল, গমনকালে সর্ব্বদা আহত হইবার সম্ভাবনা, এইপ্রযুক্ত সেইস্থল মেদদ্বারা আবৃত আছে; তাহাতেই গমনকালে মৃত্তিকাস্পর্শে পদ আহত হয় না। মেদ শরীরের উপরিভাগে থাকিয়া অঙ্গাদি আবৃত রাখে; এবং উহার তাপ-পরিচালকতা-ধর্ম্মের অল্পতা প্রযুক্ত শরীর হইতে অধিক পরিমিত তাপ বহির্গত হইতে পারে না। তাহাতেই মেদ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীর উষ্ণ থাকে, এবং শীত-নিবন্ধন কৃশকায় ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অল্প কষ্টানুভব হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

অন্ন-পরিপাক।

অন্ন আমাদিগের জীবন রক্ষার মূল। উহাদ্বারা শরীর সম্বর্দ্ধিত ও তাহার প্রাত্যহিক ক্ষতি পরিপূরিত হয়। উহা হইতেই রস, রক্ত, মাংস, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি জন্মিয়া শরীরকে রক্ষা করে। আমরা যদবস্থাপন্ন দ্রব্য ভোজন করি, তদবস্থা দর্শন করিলে উহা হইতে ঐ সকল পদার্থ উৎপন্ন হইবে, অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের কার্য্যে কিছুই অসম্ভব নাই; তিনি অচেতন পদার্থ হইতে চেতন জীব সৃষ্টি করিতেছেন, এবং চেতনকে অচেতনে পরিণত করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য সকলই অদ্ভুত ও সকলই বিস্ময়কর! তিনি শরীর-রক্ষোপযোগী পদার্থ-সকল অন্নে নিগূঢ়রূপে রক্ষা করিয়াছেন, অন্ন হইতে তৎসমুদায় সমুদ্ভূত হইয়া আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতেছে। আবার শরীর, জল ও মৃত্তিকাদিতে পরিণত হইতেছে এবং তৎসমূহ পুনর্ব্বার অন্নাকার ধারণ করিয়া জীবমণ্ডলের জীবন রক্ষা করিতেছে।

উদ্ভিজ্জ-শরীরে যেমন মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে ও পল্লব দ্বারা বায়ু হইতে পুষ্টিকর পদার্থ সংযোজিত হয়, জন্তুশরীরে পুষ্টিকর পদার্থের সংযোগ তদ্রূপ

সহজে হইতে পারে না। অঙ্গার, চূর্ণ, লবণ, যবক্ষার-জানবায়ু প্রভৃতি আমাদিগের শরীরের উপাদান। পৃথিবীতে ঐ সকল পদার্থ রাশি রাশি আছে, কিন্তু সামান্য অবস্থায় উহারা শরীরস্থ হইয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা করিতে পারে না। আমরা মাংস বা শস্যাদি যে সকল দ্রব্য ভোজন করি, ঐ সকল পদার্থ তাহাদিগেরও উপাদানরূপে থাকে, এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আমাদিগের শরীর পোষণ করে। আমরা দ্রব্যের যে অবস্থায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করি, সে অবস্থাতেও তাহাদিগের শরীর-পোষণোপযোগী শক্তি থাকে না। ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সেই সকল দ্রব্য হইতে পুষ্টিকর পদার্থ সকল পৃথক হইয়া শরীরে সংযুক্ত হয়; অবশিষ্ট ভাগ অকর্ম্মণ্য প্রযুক্ত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। যে ক্রিয়া দ্বারা ঐ ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহাকে পরিপাক-ক্রিয়া কহে। আমাদিগের শরীরে অন্নের পরিপাক অতি আশ্চর্য্যরূপে সমাধা হয়।

পাকযন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয়, তাহাকে পাকযন্ত্র কহে। পাকাশয়, যকৃৎ ও পাললিক পাক-যন্ত্রের প্রধান উপকরণ। মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া যে নলাকার প্রণালী মলদ্বার পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাকে পাকাশয় কহে। পাকাশয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ হস্ত হইবে, কিন্তু সকল স্থানে উহার ব্যাস-পরিমাণ সমান নহে। মুখগহ্বর, গলগুহা, অন্ননালী, আমাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি পাকাশয়ের ভাগ-বিশেষের ভিন্নাভিধান মাত্র।

মুখ-গহ্বর কাহাকে কহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। উহাতে ত্রিযুগল মাংসগ্রন্থি* আছে, তাহাদিগকে লালাস্রবণ কহে। স্থিতি-স্থানানুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—কার্ণান্তিক চোয়ালাধঃ ও জিহ্বাধঃ।

মুখগ-হ্বরের পরস্থিত পাকাশয়ের ভাগকে গলগুহা কহে। গলগুহা প্রায় মুখ-গহ্বরের ন্যায় আয়ত। গলগুহা হইতে যে নলাকার প্রণালী দ্বারা অন্ন উদরে গমন করে, তাহাকে অন্ননালী কহে। অন্ননালীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ ইঞ্চ এবং অন্তঃস্থ ব্যাস এক ইঞ্চের কিছু ন্যূন। অন্ননালী, বক্ষঃস্থল ও উদর-বিতানের মধ্য দিয়া গমন করিয়া উদরের কিঞ্চিৎ বামভাগে পাকাশয়ের অপেক্ষাকৃত অধিকায়ত একটী ভাগে মিলিত হইয়াছে, ঐ ভাগকে আমাশয় কহে। আমাশয়, থলির আকার এবং বক্রভাবে অবস্থিত, উহা ৩।৪

* অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিরাশি সদৃশ মাংসময় পদার্থকে মাংসগ্রন্থি কহে। সুতরাং মাংসগ্রন্থি বলিলে একটা মাত্র গ্রন্থি বুঝাইবে না, বহুল গ্রন্থি সমষ্টি একটী বস্তুকে বুঝিতে হইবে।

পিল্ট † সামগ্রীতে পূর্ণ হইতে পারে। উহার গাত্রে বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসগ্রন্থি আছে।

আমাশয় হইতে আবার পাকাশয়ের পরিসর অল্প হইয়াছে। আমাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৩।০ হস্ত পরিমিত পাকাশয়ের ভাগকে ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পক্কাশয় কহে। উহার গঠন নলাকার, কিন্তু উহার মধ্যে অনেক গুলি ভাঁজ আছে। সকল স্থানে উহার ব্যাস-পরিমাণ সমান নহে, কোন স্থলে ১ ইঞ্চ ও স্থলান্তরে ১৫ ইঞ্চ হইবে। ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে মল-নালী পর্য্যন্ত সমুদায় ভাগ বৃহৎ অন্ত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। বৃহৎ অন্ত্র প্রায় ৪।০ হস্ত দীর্ঘ এবং উহার ব্যাস-পরিমাণ প্রায় ২॥০ ইঞ্চ। ক্ষুদ্র অন্ত্র অপেক্ষা ইহার ব্যাস-পরিমাণের আধিক্য আছে বলিয়া ইহা বৃহৎ অন্ত্র নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহৎ অন্ত্রের গঠনপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। ইহার সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গুরীয়াকার সংকোচন বিশিষ্ট। আমাশয়ের ন্যায় অন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গও মাংসগ্রন্থি সম্পন্ন। বৃহৎ অন্ত্র হইতে মল-দ্বার পর্য্যন্ত পাকাশয়ের ভাগ মল-নালী নামে অভিহিত হইল। মলনালীর দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চ এবং বৃহৎ অন্ত্র হইতে ইহার ব্যাস-পরিমাণ কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহা নলাকার, কিন্তু ইহার প্রান্ত-

† মাপের পাত্র, প্রায় আধ সের হইবে।

ভাগে মল আসিয়া জমিতে পারে, এমত পরিসরিত স্থান আছে।

পাকাশয়ের দৈর্ঘ্য এত অধিক হইলেও তাহা জড়িতাকারে শরীরের অল্পায়ত অংশবিশেষ মধ্যে যথোচিতরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। উহার বক্রতা দ্বারা তন্মধ্যে খাদ্যের গতি নিরোধ হয় না; বরং আবশ্যকমত গতি হইয়া রীতিমত পরিপাকক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে।

গলগুহা হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত পাকাশয়ের অন্তর্দ্দেশ একপ্রকার আবরণে আবৃত আছে—তাহাকে শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্ কহে। ঐ ত্বক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা, লসীকাবহ নাড়ী, এবং অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র সমাকীর্ণ। ঐ ত্বকের বহির্দ্দেশ পেশী-সূত্রের দুই স্তরে আবৃত; এবং সমুদায় আবার একপ্রকার মাস্তুক আবরণে বেষ্টিত আছে। পাকাশয়ের গাত্রস্থ শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্ হইতে অনবরতই শ্লেষ্ম-বিশেষ নিস্রুত হইয়া থাকে।

শরীরের দক্ষিণ ভাগে উদর-বিতানের অব্যবহিত নিম্নে যকৃৎ অবস্থিত। উহার উপরিভাগ আমাশয় ও অন্ত্রের উপরি আছে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে যকৃতের পরিমাণ প্রায় /১৸৵০ ছটাক হইবে। উহার দৈর্ঘ্য ১০।১২ ইঞ্চ, প্রস্থ ৬।৭ ইঞ্চ এবং সর্ব্বা-

ধিক বেধ ৩ ইঞ্চ হইবে। উহা হইতে একটী প্রণালী নির্গত হইয়া আমাশয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে।

পাললিক, আমাশয়ের নিম্নে আড়ভাবে বিস্তৃত আছে। উহা কেবল মাংসময় পিণ্ড, এইহেতু পাললিক নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যকৃৎ হইতে একটী প্রণালী আসিয়া পাকাশয়ের যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, পাললিক হইতেও একটী প্রণালী নিঃসৃত হইয়া পাকাশয়ের সেই স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে।

পাকাশয়ের মধ্যে মধ্যে কপাট আছে। ঐ সকল কপাট, পাকাশয়ের পথ আবশ্যকমতে রুদ্ধ বা মুক্ত করিয়া দেয়। মুখগহ্বর ও গলগুহা এই উভয়ের মধ্যে একখানি কপাট আছে—উহাকে উপজিহ্বা কহে। অন্ন, মুখগহ্বর হইতে গলগুহায় গমনকালে ঐ কপাট পশ্চাৎদিকে অপসৃত হইয়া পথ প্রদান করে। আমাশয় হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্র-প্রবেশমুখে একখানি পেশী আছে; ঐ পেশীও কপাটবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। ঐ পেশীকে দ্বাররক্ষী পেশী কহে। আমাশয়ে অন্নের যেরূপ পরিপাক হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই, ঐ দ্বাররক্ষী পেশী ক্ষুদ্র অন্ত্রে অন্নের গমনপথ মোচন করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্রমধ্যেও একখানি কপাট আছে। জগদীশ্বর এই সকল কপাট,

এমনি কৌশলে স্থাপিত করিয়াছেন যে, ইহারা আপনাদিগের কার্য্যকাল আপনারাই বুঝিতে পারিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

পাচক্ রস—পাঁচ প্রকার রস সংযোগে অন্নের পরিপাক হয়। সামান্যতঃ ঐ সকল রসকে পাচক রস কহে। ঐ সকল পাচক রসের পৃথক্ পৃথক্ নাম এই; লালা, আমাশয়িক রস, পাললিক রস, পিত্ত ও অন্ত্ররস। এই সকল রস শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থল-নিস্রুত রসের ন্যায় রক্তহইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু উহারা রক্ত হইতে জন্মিলেও রক্তের প্রকৃতির সহিত উহাদিগের প্রকৃতির ভূয়িষ্ঠ ভেদ আছে, যে সকল পদার্থের ভাগ-পরিমাণ রক্তে অতি অল্প আছে, ঐ সকল রসে তাহাদিগের আধিক্য দেখা যায়। আবার রক্ত ক্ষারাস্বাদ হইলেও তন্নিস্রুত রস অম্ল বোধ হয়, কখন বা রক্তের ক্ষারবত্তা অপেক্ষা তৎস্রুত রসে অধিক পরিমাণে ক্ষার দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন রস-স্রবণ-গ্রন্থি হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রস নির্গত হয়। আমাশয়িক রস অম্ল এবং অন্ত্ররস ক্ষারযুক্ত দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন একপ্রকার রসস্রবণগ্রন্থি হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসস্রাব হয়। কিন্তু কিরূপে এই সকল অদ্ভুত ঘটনা সঙ্ঘটন হয়, তাহার কারণ সম্যক্ অবধারিত হয় নাই।

মুখ-মধ্যস্থ লালা-স্রবণ গ্রন্থি হইতে লালা নির্গত হয়। লালা প্রায় অনবরতই মুখমধ্যে প্রস্রুত হইয়া থাকে। সকল লালা-স্রবণ গ্রন্থি হইতে একপ্রকার লালা নিস্রুত হয় না। জিহ্বাধঃ গ্রন্থি অপেক্ষা চোয়ালাধঃ গ্রন্থি-নিঃসৃত লালায় জলের ভাগ অল্প, এবং কর্ণান্তিক গ্রন্থি নিঃসৃত লালায় জলের ভাগ অধিক। লালা ঈষৎ আঠাযুক্ত, নির্গন্ধ ও অল্পস্বাদু খাদ্য চর্ব্বণকালে যে লালা প্রস্রুত হয় তাহা ঈষৎ ক্ষার। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মুখে প্রতিদিবস ॥০ হইতে ॥৵০ ছটাক পর্য্যন্ত লালা প্রস্রুত হইয়া থাকে।

আমাশয়স্থ গ্রন্থিস্রুত রসকে আমাশয়িক রস কহে। আমাশয়িক রস বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। জন্তুগণের গাত্রগত গন্ধানুরূপ তাহাদিগের আমাশয়িক রসে কিছু কিছু গন্ধ অনুভূত হয়। আমাশয়িক রসের আস্বাদ কিঞ্চিৎ লবণ। আমাদিগের শরীরের ঐ রসের ভার জল অপেক্ষা বড় অধিক নহে। যে পাত্র পরিমিত জল এক শত সের ভারী, সেই পাত্র-মিত আমাশয়িক রস এক শত বিংশতি সেরের অধিক ভারী নহে। ঐ রসে শতকরা ৯৯ অংশ জল আছে, অবশিষ্ট ভাগ একপ্রকার লাবণ ও জারক পদার্থ মাত্র।

পাললিক হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে পাললিক রস কহে। পাললিক রস বর্ণ-বিহীন;

উহাতে যে যে পদার্থ আছে, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। কোন পণ্ডিতের মতে উহা ক্ষারযুক্ত ও কোন পণ্ডিতের মতে অম্লবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যকৃৎ হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহা পিত্ত নামে খ্যাত। পিত্ত তরল ঈষৎক্ষারযুক্ত; হরিদ্রাভ পিঙ্গলবর্ণ এবং তিক্ত ও মধুর রসাশ্রিত স্বাদ। পিত্তে শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ জল আছে; এবং উহাতে দুই প্রকার লাবণ পদার্থ আছে। পাললিক রস ও পিত্ত অন্ত্রের একস্থানে আসিয়া জমিতে থাকে।

অন্ত্র-গাত্রস্থ শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বকে যে সকল মাংস-গ্রন্থি আছে, তৎস্রুত রসকে অন্ত্ররস কহে। অন্ত্ররস, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, ও ক্ষারযুক্ত।

এই সকল রস-সংযোগে অন্নের পরিপাক-ক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক রসদ্বারা তন্নির্ব্ব স্থলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অন্নের পরিপাক হয় না। মুখ হইতে অন্নের পাকাশয়-মধ্যে গমন কালে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল রস তাহাতে মিলিত হইয়া তাহার পরিপাক ক্রিয়া সমাধা করে। এই পরিপাক-ক্রিয়াদ্বারা অন্ন হইতে পুষ্টিকর পদার্থ পৃথক্ হইয়া, শরীরে থাকিয়া যায়; অবশিষ্ট অসার ভাগ শরীর হইতে বহির্গত হয়।

খাদ্য দ্রব্যের সহিত পাচক রসের সম্বন্ধ—সকল বস্তু সকল প্রকার পাচক রসে পাচ্য নহে। কোন

বস্তুর পাকক্রিয়া সম্পন্ন জন্য, তাহাতে বিশেষরূপে লালার সংযোগ আবশ্যক করে। কোন বস্তুর পাকক্রিয়ায় তদ্দ্বারা কিছু আনুকূল্য হয় না। পরীক্ষাদ্বারা অবধারিত হইয়াছে, মেদ, তৈল, নবনীত প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের স্নৈহিক অংশ ও যবক্ষারজান-বিশিষ্ট খাদ্য পরিপাক বিষয়ে লালার কিছু সহায়তা নাই। উহা দ্বারা কেবল খাদ্য দ্রব্যের শিটিভাগ পাচিত হয়। আবার, শস্যাদির শ্বেতসার,* লালার সংযোগ ভিন্ন অন্যান্য পাচক রসে কোন ক্রমেই পরিপাক হয় না।

আমাশয়িক রসেও সকল দ্রব্য সমানরূপ পরিপাক হয় না। এই নিমিত্ত, সকল দ্রব্য সমান কাল, আমাশয়ে থাকে না। একাসনে বসিয়া মাংস ও শস্যাদি আহার করিলে, শস্যাদি ত্বরায় আমাশয় হইতে বহির্গত হইয়া যায়; কিন্তু মাংস তাহাতে দীর্ঘ কাল থাকিয়া জীর্ণ হয়। খাদ্যের সূত্র জনক পদার্থ, গ্লুটেন* ও আল্‌বুমেন* এবং পানীর্য্য* পদার্থ আমাশয়িক রসে জীর্ণ হয়। উহা দ্বারা মেদ ও তৈল জীর্ণ হয় না। শস্যাদির শ্বেতসার, চিনি, ও ঘননির্যাস* পরিপাক বিষয়েও উহার সহায়তা নাই। জলপাচ্য সমুদায় দ্রব্য তদ্দ্বারা জীর্ণ হয়; তদ্ভিন্ন ফস্‌ফেট অফ্‌ মেগ্‌নিসিয়া, লৌহ প্রভৃতি অনেক পদার্থ তদ্দ্বারা

* পরিশিষ্টে দেখ।

পাচিত হইয়া থাকে। রুটী গোলআলু প্রভৃতি শিটি-বহুল দ্রব্য আমাশয়ে সর্ব্বতোভাবে জীর্ণ হয় না; অন্ত্র-মধ্যে উহাদিগের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়। অতএব ভুক্ত দ্রব্যের আমাশয়ে স্থিতিকাল অনুসারে তাহার লঘুপাকত্ব বা গুরুপাকত্ব জানা যায় না। দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদিও ত্বরায় আমাশয় হইতে অন্ত্রে নিঃসৃত হয়, এবং সুখ-পাচ্য সামগ্রীও তথায় দীর্ঘকাল থাকে। শস্যাদি অপেক্ষা মাংস হইতে পুষ্টিকর পদার্থ পাক-ক্রিয়া দ্বারা সহজে পৃথক হইতে পারে; সুতরাং শস্যাদি অপেক্ষা মাংস লঘুপাক বলিয়া গণ্য। কিন্তু ঐ উভয় প্রকার খাদ্য এক সময়ে আহার করিলে শস্যাদি আমাশয়হইতে শীঘ্র বহির্গমন করে, অথচ মাংস তাহাতে থাকিয়া যায়। অতএব পাকাশয়ের যে কোন স্থান হউক, যে খাদ্য সহজে পরিপাক হয়, তাহাই লঘুপাক বলিয়া বাচ্য।

খাদ্যের যে স্নৈহিক ভাগ লালা ও আমাশয়িক রস দ্বারা জীর্ণ না হয়, তাহা পাললিক রসে জীর্ণ হয়। পাললিক রসদ্বারা শস্যাদির শ্বেতসারও জীর্ণ হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা খাদ্যের শিটি ভাগ জীর্ণ হয় না। পিত্ত অন্যান্য রস অপেক্ষা পাকবিষয়ে অল্প কার্য্যকারী। উহা দ্বারা দ্রব্যের শিটিভাগ জীর্ণ হয় না, এবং পাল-লিক রস দ্বারা যেমন স্নৈহিক ভাগ পাচিত হয়, উহা

দ্বারা তাদৃশ হয় না, ফলতঃ পাককার্য্যে উহা কেবল পালনিক রসের সহায়তামাত্র করিয়া থাকে। পিত্ত-দ্বারা মল নিঃসরণেরও অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। ভুক্ত-দ্রব্যের সহিত অন্ত্ররসের সংযোগ কালে তাহাতে অপরাপর পাচক রস মিলিত থাকে, সুতরাং পাক-ক্রিয়ায় অন্ত্র-রসের কার্য্যকারিতা নিশ্চিত রূপে অব-ধারিত হইতে পারে নাই। পণ্ডিত ফেরিক্স্ কহেন, মেদ ও শস্যাদির শ্বেতসার পরিপাক বিষয়ে অন্ত্র-রসের কিছু কার্য্যকারিতা আছে।

চর্ব্বণক্রিয়া—আমরা হস্ত দ্বারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া মুখমধ্যে প্রবেশিত করি। বাহুর সন্ধিনিচয় এবং গ্রীবা-কশেরুকার নমনীয়তা গুণ দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুখগহ্বর অপেক্ষা খাদ্য বৃহৎ হইলে অস্ত্র, হস্ত, অথবা ছেদন দন্ত দ্বারা তাহা কর্ত্তিত করিয়া লই। মুখমধ্যে প্রবেশিত হইলে দন্তদ্বারা চর্ব্বিত হইতে থাকে। চর্ব্বণকালে লালাস্রবণ গ্রন্থি হইতে লালা নির্গত হইয়া অন্নের সহিত মিলিত হয়। অন্নের পরিপাক বিষয়ে লালার বিশেষ সহায়তা আছে। বিশেষতঃ অন্ন ভালরূপে চর্ব্বিত হইলে উহার অন্তর ও বাহির প্রায় সমুদায় ভাগে পাচক-রসের বিশেষরূপে সংযোগ হইয়া পরিপাক-ক্রিয়ার ভূয়িষ্ঠ উপকার হয়। সকল দ্রব্যের সমানরূপ চর্ব্বণ

আবশ্যক করে না। মাংস অপেক্ষা শস্যাদির চর্ব্বণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। শস্যাদির পুষ্টিকর পদার্থ তন্তু-পরিস্থ ত্বগ্‌বিশেষদ্বারা আবৃত থাকে। অতএব, তাহা অচর্ব্বিত উদরস্থ হইলে পাচকরসের সহিত তাহার সংযোগ হইতে পারে না। সুতরাং তাহা অপক্ক থাকিয়া যায় ও পীড়া জন্মে। মাংস অপেক্ষা শস্যাদি চর্ব্বণের অধিক আবশ্যকতা বলিয়া মাংসাহারী জীব অপেক্ষা শস্যভোজী-জন্তুগণ খাদ্য দ্রব্য অধিক চর্ব্বণ করিয়া থাকে। চর্ব্বণের আবশ্যকতা অনুসারে জন্তু-বিশেষে দন্তের গঠনভেদও আছে। মাংসাদদিগের দন্ত খাদ্য গ্রহণ ও ছেদন করিবার এবং শস্যাশীদিগের দন্ত খাদ্য চর্ব্বণ করিবার অধিক উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

গো মহিষাদি রোমন্থিক জন্তুগণ তৃণাদি একবার গলাধঃকরণ করিয়া পুনর্ব্বার উদ্গীরণ পূর্ব্বক চর্ব্বণ করিয়া থাকে। তাহারা যে সকল দ্রব্য ভোজন করে, তাহা শিটি-বহুল; সুতরাং তৎসমুদায় অচর্ব্বিত থাকিলে ও লালার সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত না হইলে কোন ক্রমে পরিপাক হয় না। বৃদ্ধ গো, অশ্বাদির দন্ত পড়িয়া গেলে, অচর্ব্বিত খাদ্য উদরস্থ হইয়া উহাদিগের জীবন শেষ হয়। এই নিমিত্ত তৎকালে তাহাদিগের খাদ্য পিষ্ট ও চূর্ণ করিয়া

দিতে হয়। আমরা রন্ধন করিয়া শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া থাকি। রন্ধন ক্রিয়ায় জলে আর্দ্র হইয়া ও অগ্নির উত্তাপে শস্যাদির ত্বক্ ভেদ হইয়া যায়, তাহাতে চর্ব্বণক্রিয়ার অনেক আনুকূল্য হয়। কিন্তু তাহা হইলেও খাদ্যের সহিত লালার সংযোগ জন্য চর্ব্বণের আবশ্যকতা থাকে। লালার সংযোগে অন্নের কোমলত্ব জন্মিয়া তাহা গলাধঃকরণেরও অনেক সহায়তা হইয়া থাকে। চর্ব্বণকালেই কেবল অন্নের সহিত লালার সংযোগ হয়, এমত নহে। উহা অনু-ক্ষণ মুখমধ্যে প্রস্রুত হইতেছে। লালা আপন কার্য্যে এমনি সতর্ক যে, খাদ্যের নাম শুনিলে বা তৎপ্রাপ্তির প্রত্যাশা পাইলেও নিস্রুত হইয়া থাকে। কি জানি, উদরম্ভরিতা বা অনভিজ্ঞতা দোষে ব্যস্ততা প্রযুক্ত, কোন খাদ্য লালার সংযোগ ব্যতীত উদরস্থ হইয়া থাকে, এই জন্য খাদ্য উদরস্থ হইলেও লালা সময়ে সময়ে গলাধঃকৃত হইয়া অন্নের সহিত সংযুক্ত হয়। জগদীশ্বরের করুণার সীমা নাই! তিনি আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত করুণা বিস্তারের কোন অংশেই ক্রুটী করেন নাই।

পান ও চূষণক্রিয়া—সকল দ্রব্যই চর্ব্বিত হইয়া উদরস্থ হয় না। কোন দ্রব্য লেহন, কোন দ্রব্য চূষণ ও কোন দ্রব্য পানক্রিয়া দ্বারা উদরস্থ হইয়া থাকে।

তরল পদার্থ পান ও চূষণ দ্বারা গলাধঃকৃত হয়। শিশুদিগের স্তন্যপান ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে সমাধা হয়। যেরূপ পিচ্‌কারীমধ্যে জল প্রবিষ্ট হয়; শিশু-মুখেও সেইরূপে স্তন্য প্রবেশ করে। শৃঙ্গমধ্যে জল তুলিতে হইলে উহার মুখ জলপাত্রে মগ্ন করিয়া তন্মধ্যস্থ দণ্ড, যাহা পূর্ব্বে উহার অন্তর্ভাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রবেশিত থাকে, কিয়দ্দূর টানিয়া তুলিতে হয়। ঐ দণ্ড টানিয়া তুলিলেই পিচ্‌কারীর অগ্রভাগ বায়ুশূন্য হয়। সেই সময়ে শৃঙ্গের মুখের চতুঃপার্শ্বস্থ জলে বাহ্যবায়ু নিপীড়ন করাতে ও তাহার মুখের সমীপবর্ত্তী জলভাগে কোন প্রকার চাপ না পড়াতে উহা ঊর্দ্ধগত হইয়া শৃঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। শিশু-দিগের স্তন্যপান ক্রিয়াও ঐরূপে হইয়া থাকে। শিশুমুখ জননীর স্তনোপরি এরূপে লগ্ন হয় যে, বাহ্যবায়ু মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। অনন্তর জিহ্বা মুখমধ্যে অপসারিত হইয়া শৃঙ্গদণ্ডবৎ কার্য্য করে। তাহাতেই মুখ-গহ্বর কিয়ৎপরিমাণে বায়ুশূন্য হয়। শিশুমুখের চতুঃপার্শ্বস্থ স্তনভাগে বাহ্যবায়ুর নিপীড়ন বন্ধ থাকে; কিন্তু চুচুক মুখমধ্যে প্রবিষ্ট থাকায় তদুপরি আর চাপ পড়ে না; সুতরাং বাহ্য-বায়ুর দ্বারা স্তনের অপরভাগ নিপীড়িত হওয়ায় স্তনান্তর্গত দুগ্ধ মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে।

গ্লাসাদি চুম্বনদ্বারা জল কিংবা দুগ্ধপানেও ঐরূপ কার্য্য হয়। তৎকালে ওষ্ঠ জলোপরি ও অধর গ্লাসে সংলগ্ন হইয়া মুখমধ্যে বাহ্যবায়ুর গমন নিরোধ করে, এবং জিহ্বা উপরি উক্ত মত কার্য্য করাতে বাহ্যবায়ুর নিপীড়ন দ্বারা পাত্রস্থ জল বা দুগ্ধ মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—লালার সংযোগে মুখ-গহ্বর মধ্যেই অন্নের পরিপাক ক্রিয়ার সূচনা হয়। অনন্তর অন্ন মুখ-গহ্বর হইতে গলগুহায় গমন করে। গল-গুহায় গমনকালে উপজিহ্বা অপসারিত হইয়া পথ প্রদান করে, এবং সেই সময়ে তালুগত বায়ু প্রবেশ দ্বার নিরোধ করিয়া তন্মধ্যে অন্ন প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। অন্ন, গলগুহা হইতে অন্ননালী দিয়া আমাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে অন্ননালীর যে মুখ আমাশয়ে মিলিত হইয়াছে, তাহা রুদ্ধ হইয়া আমাশয়স্থ অন্নকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে দেয় না। অন্ননালীর ঐ মুখ ঐরূপে রুদ্ধ হইয়া না গেলে আমা-শয়িক পেশী-বলে ভুক্ত-অন্ন বমিত হইয়া পড়িত। আমাশয়ে অন্নের সংযোগে তত্রত্য রস নিঃসৃত হই-তে থাকে। কেবল খাদ্যদ্রব্য আমাশয়ে প্রবিষ্ট হই-লে ঐ রস নিঃসৃত হয় এমত নহে, উহার মধ্যে যে-কান দ্রব্য পড়িলেই সেই স্থানের ভাবান্তর বিশেষ

উপস্থিত হইয়া ঐ রস নির্গত হইতে থাকে। অন্ন আমাশয়ে গিয়া তদ্গত পেশীবলে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ঐরূপ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন এই; তদ্দ্বারা আমাশয়ের গাত্রনিস্রুত পাচক রস ভুক্তদ্রব্যের সমুদায় ভাগে লগ্ন হয়। আমাশয়ে কেবল তৎস্রুত রসের দ্বারা অন্নের পরিপাক কার্য্য হয় এমত নহে; মুখমধ্যে লালার সংযোগে উহার পাকক্রিয়ার যে সূচনা হয়, তাহাও ঐ স্থানে সম্পন্ন হইতে থাকে। অনন্তর, আমাশয় হইতে অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও লালার অনেক কার্য্য হইয়া তথায় উহার সম্পূর্ণ কার্য্য সমাধা হয়।

আমাশয়-মধ্যে অন্নের পরিপাককালে বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল বায়ু তত্রত্য অম্ল-বাষ্পের সহিত কখন কখন মিলিত হইয়া দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। আমরা উদ্গার তুলিলে কখন কখন যে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহার কারণ ঐ। পরিপাক-কালে আমাশয়ে যে সকল বায়ু উৎপন্ন হয়, তাহারা লঘুভার প্রযুক্ত তাহার উপরিভাগে, জমিতে থাকে। আমরা উচ্চগ্রীব হইয়া বসিলে অথবা দাঁড়াইলে কিম্বা ভ্রমণ করিলে ঐ সকল বায়ু অনায়াসে উদ্গীরিত হয়।

ভুক্ত দ্রব্য আমাশয়ে যত দূর জীর্ণ হওয়া উচিত, তত দূর জীর্ণ হইলে তন্নিম্নস্থ দ্বাররক্ষী পেশী আপনা

হইতে অন্ত্রমধ্যে অন্নের গমনপথ মোচন করে। ঐ পথ কখনও তাহার পূর্ব্বে বা পরে মুক্ত হয় না। পথ মোচিত হইলে আমাশয়স্থ ঈষৎপক্কান্ন ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে। তথায় উহা পিত্ত, পানক্রিয়-রস ও অন্ত্র-রসের সহিত মিলিত হয়। ঐ সকল রসের সংযোগে অন্নের পুষ্টিকর পদার্থ দুগ্ধবৎ নির্গত হইয়া অন্ত্রের গাত্রগত অসঙ্খ্য শোষণী নাড়ী-পথে অথবা একেবারে শিরাস্থ শোণিতের সহিত মিলিত হয়। কেবল অন্ত্রমধ্য-দিয়া গমনকালে অন্নের সার ভাগ শরীরে শোষিত হয় এমত নহে; আমাশয় মধ্যেও উহার কতক ভাগ শোষিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র অন্ত্রে ভাঁজ ভাঁজ থাকাতে উহার বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অন্তর্দ্দেশের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছে। সুতরাং অধিক পরিমিত স্থানের সহিত অন্নের সংযোগ হয়, এবং উহার গতিও ঐ সকল ভাঁজ দ্বারা প্রতিহত হওয়ায় মৃদু হইতে থাকে, অতএব ক্ষুদ্র অন্ত্র-মধ্যে উহার দীর্ঘকাল স্থিতি সাধিত হওয়ায় উহার প্রায় সমুদায় পুষ্টিকর পদার্থ তন্মধ্য হইতেই শরীরে শোষিত হয়।

অন্ত্র-মধ্যেও অন্ন পরিপাক-কালে বায়ু উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাশয়ে যে সকল বায়ু উদ্ভূত হয়, ইহাতে তৎ সমুদায় বায়ু জন্মে না। আমাশয়িক বায়ুতে অম্লজান ভাগ থাকে, আন্ত্রীয় বায়ুতে তাহা থাকে না।

উহাতে প্রধানতঃ দ্রাম্ল অঙ্গারক ও উদজান বায়ু থাকে। সেই বায়ু-বেগে, ও অন্ত্র-গাত্রে পেশীসূত্রের যে দুই স্তর আছে তাহার বলে, অন্ত্র-মধ্যে উহার গতি সাধিত হয়। অন্নের ঐরূপ গতি আমাদিগের ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে। অন্ত্রগাত্রে অন্নের সংস্পর্শ হইলেই তদ্গত পেশীসূত্র আপনা হইতে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া উহার তরঙ্গবৎ গতি সাধন করে। ভুক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহৎ অন্ত্রে গমন করে। উহা যে অবস্থায় বৃহৎ অন্ত্র মধ্যে যায়, তদবস্থায় তাহাতে অল্পমাত্র পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। বৃহৎ অন্ত্র-মধ্যেই উহাতে দুর্গন্ধ জন্মে। ঐ দুর্গন্ধের অধিক অংশ অপক্ক পদার্থ পচিয়া জন্মিয়া থাকে। সকল দ্রব্যে সমান দুর্গন্ধ হয় না। মাংসাদি অপেক্ষা তৃণাদি জীর্ণ হইয়া যে অসার ভাগ থাকে, তাহাতে তাদৃশ দুর্গন্ধ জন্মে না। এই জন্য মাংসাদ জন্তুদিগের মলে যেরূপ দুর্গন্ধ হয়, তৃণাহারীদিগের মলে সেরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না।

বৃহৎ অন্ত্র মধ্যে সর্ব্বতোভাবে পুষ্টিকর পদার্থ বিহীন হইয়া ভুক্তান্নের অসার ভাগ মল-নালীতে গমন করে। তৎপরে মলদ্বার দিয়া শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। অন্নের অসার ভাগের সহিত পিত্ত ও অন্ত্র-গাত্রস্থ অন্তস্ত্বক্-নিঃসৃত শ্লেষ্মবিশেষ নির্গত হইয়া থাকে।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা—আমরা যে সকল দ্রব্য প্রত্যহ ভোজন করিতেছি, তাহার সার ভাগ শরীরের সহিত যোজিত হইয়া অসার ভাগ নির্গত হইয়া যাইতেছে; আবার আমাদিগের ভোজন-প্রবৃত্তি হইতেছে। এই ভোজন-প্রবৃত্তি বিধান করিয়া অনন্ত জ্ঞানশালী পরমেশ্বর কি অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। পোষণাভাবে আমাদিগের শরীর নষ্ট হইয়া না যায়, এই অভিপ্রায়ে ভুক্তান্নের পরিপাক হইলেই তিনি আমাদিগের বুভুক্ষার উদ্রেক করিয়া দেন। প্রথমতঃ ঐ বুভুক্ষা আমাদিগের ক্লেশকর হয় না; কিন্তু ভোজনের যত আবশ্যকতা হইতে থাকে, ও আমরা সেই আবশ্যকতা বিমোচন না করি, ততই আমাদিগের যন্ত্রণা বোধ হয়। অভোজন-জন্য যে যন্ত্রণা হয়, তাহা ক্ষুধা নামে বাচ্য। ক্ষুধা জন্য যে যাতনা হইয়াথাকে, তাহাও আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত কল্পিত। দীর্ঘকাল অনাহারী থাকিলে শরীর নষ্ট হইতে থাকে, অতএব আমাদিগকে তাহার প্রতীকারে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ঐ যাতনা অনুভূত হয়৷ অন্যান্য যাতনার ন্যায় ঐ যাতনারও ক্রম আছে, জ্বরাদি নানা রোগে ও আকস্মিক কোন প্রকারে শরীরে কিছু অত্যাচার হইলে যেরূপ অনিষ্টের ক্রমানুসারে আমাদিগের কষ্ট বোধ হয়, ইহাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যে

পরিমাণে নিয়ম পালনের ব্যত্যয় ও তন্নিবন্ধন বিপদের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে ঐ যাতনার বৃদ্ধি হইয়া নিয়ম-লঙ্ঘন জন্য অত্যাচারের প্রশমনার্থ আমাদিগকে সতর্ক করিতে থাকে।

বাসস্থান ও শরীরের অবস্থা ভেদে ক্ষুদ্বোধের ভেদ হইয়া থাকে। নীচস্থান ও উষ্ণস্থান বাসীদিগের অপেক্ষা উচ্চস্থান ও হিমপ্রধান স্থানবাসীদিগের অধিক ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অলস অপেক্ষা পরিশ্রমীদিগেরও অধিক ক্ষুধা হইয়া থাকে। এবং শিশুদিগের ও রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষুধা, পূর্ণবয়স্ক ও নিয়ত স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের দিবসের মধ্যে ২।৩ বার মাত্র ক্ষুধা হয়, কিন্তু সদাচল নভশ্চরদিগের ক্ষুধা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং নিম্নস্থান বাসী মৃদুচল ভূচরদিগের তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূন হয়। এই জন্য এক দিবসের অনাহারে পক্ষীদিগের মৃত্যু হয়, ও ভূচর কীটাদি অনাহারে কতিপয় মাসাত্মক কালও জীবিত থাকে। শ্রুতি আছে, জলৌকাগণ একবার রক্তপান করিলে তাহা পরিপাক করিতে তাহাদিগের এক বৎসর লাগে। উষ্ণদেশীয় লোকদিগের অপেক্ষা শীতপ্রধান জনপদ বাসীদিগের অধিক ক্ষুধা হয়। যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে শরীরগত

উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্য সেই পরিমাণে ভোজন করিয়া শীতল দেশীয় লোকেরা শীত হইতে পরিত্রাণ পায়। প্রাত্যহিক ক্ষতিপূরণ ভিন্ন শিশু-দেহের সম্বর্দ্ধন, *এবং রোগ-মুক্তদিগের রোগজন্য শরীরের যে ক্ষয় হইয়া থাকে তাহার সম্পূরণ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং তজ্জন্য তাহাদিগের অধিক পরিমিত খাদ্যের প্রয়োজন হয়; এবং সেই প্রয়োজন সাধনজন্য বারম্বার ক্ষুধা হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রমে শরীরের রক্ত-সঞ্চার বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্র শীঘ্র রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ শরীরে যোজিত হইতে থাকে; তদনুসারে শীঘ্র শীঘ্র ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া তাহার সারভাগ রক্তের সহিত মিলিত হয়। সুতরাং তাহাতে ক্ষুধার আতিশয্যও হইয়া থাকে। আলস্যে সেরূপ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পরি-শ্রমী ব্যক্তিরা অধিক-পরিমিত সামগ্রী ভোজন পান করে, ও আমাদিগের দেশের ধনালস মহাশয়েরা সর্ব্বদা অজীর্ণ রোগের যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকেন। ভোজনদ্বারা রোগী-দিগের রোগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, এই হেতু পীড়িত-দিগের অপেক্ষা স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তি-দিগের অধিক ক্ষুধা হয়। সকল ব্যক্তির সকল সময়ে ক্ষুদ্‌বোধ হয় না। অভ্যাসধর্ম্মে এক জনের যে সময় ও দিবসের মধ্যে যতবার ক্ষুধার

উদ্রেক হয়, অন্যের সে সময়ে ও ততবার হয় না। একাহারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিধবাদিগের ক্ষুধা প্রতি-দিবস মধ্যাহ্ন-কালে একবার উদয় হয়, কিন্তু আমা-দিগের দেশীয় অন্যান্যের কাহার দিবসের মধ্যে দুই বার কাহার বা তিন বার ক্ষুদ্‌বোধ হয়। ফলতঃ ভুক্তদ্রব্য যাহার যত শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহার তত শীঘ্র ক্ষুধার উদয় হইয়া থাকে।

যেমন ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া পুনর্ব্বার ভোজনের আবশ্যকতা হইলে বুভুক্ষা হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন কারণে শরীরের জলীয় ভাগের হ্রাস হইয়া জলের প্রয়োজন হইলে পিপাসার উদ্রেক হয়। উচ্চ স্থানে উঠিলে ফুস্ফুস ও চর্ম্ম হইতে অধিক পরিমিত বাস্পোদ্‌গম হইয়া শরীরের জলভাগ ম্লান হয়, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া রক্তের জলভাগ হ্রাস হইয়া যায়, অতএব সেই সেই সময়ে আমাদিগের পিপাসা হইয়া থাকে। যে সকল রোগে অতিশয় মূত্রস্রাব বা রক্ত নির্গত হয়, তাহাতেও পিপাসার বাহুল্য হইয়া থাকে। লবণ পরিপাক করিবার নিমিত্ত অধিক জলের আবশ্যকতা হয়, অতএব রক্তের জলভাগ পাচক রসাকারে নিস্রুত হইয়া তাহার পরিপাক করে। এই নিমিত্ত অধিক লবণ খাইলেই পিপাসা হইয়া থাকে। মরীচ ও

অন্যান্য মসল্লাদি খাইলেও ঐরূপে পিপাসা জন্মে। যে রূপে হউক, রক্তের জলীয় ভাগ হ্রাস হইলেই পিপাসা হয়। অতএব, যাহাতে রক্তে জলসংযোগ হয়, তাহা করিলেই পিপাসার প্রতিকার হইতে পারে। ঐ রূপ জলযোগ কেবল পান দ্বারা সম্ভবে এমত নহে। শরীরের উপরিভাগে জলসংযোগ করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। এই জন্য পিপাসু ব্যক্তি স্নান করিলেও তাহার তৃষ্ণা শান্তি হইয়া থাকে। সমুদ্রপথে গমন কালে জাহাজ বিনষ্ট হইলে জাহাজস্থ যে সকল লোক জীবিত থাকে, সমুদ্র-জলের লবণত্ব প্রযুক্ত তাহারা পানীয় অভাবে তৃষিত হইলে মধ্যে মধ্যে জল-নিমজ্জন দ্বারা পিপাসার শান্তি করিয়া থাকে। জলনিমজ্জন করিলে তাহাদিগের গাত্রে যে জল সংযোগ হয়, তাহার লবণভাগ বিশ্লিষ্ট হইয়া নির্ম্মল জল চর্ম্মপথে রক্তস্থ হইয়া থাকে।

ক্ষুধা অপেক্ষা পিপাসার অসহনীয়তা অধিক। ভোজ্য অভাবে লোকে যত কষ্ট পায়, পানীয় অভাবে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ করে, এবং ভোজন না করিলে যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, পানীয় অভাবে তাহা অপেক্ষা অনেক ত্বরায় জীবন শেষ হয়। কোন ব্যক্তি পান ভোজন উভয়ই বিরহিত হইলেও ভোজন অপেক্ষা পানাভাবে অধিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

খাদ্যের পরিপাক কাল—সকল দ্রব্য সমান কালে জীর্ণ হয় না। মাংস অপেক্ষা শস্যাদি দুষ্পাচ্য। তাহাদিগের উপরিস্থ ত্বগাদিতে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত করে। যে সকল শস্য রন্ধন-ক্রিয়ার দ্বারা দ্রবীভূত বা সম্যক্ প্রকারে চর্ব্বিত না হয়, তাহারা যে আকারে উদরস্থ হয়, তদাকারেই বহির্গত হইয়া যায়। মেদ, নবনীত, তৈল এবং বাদাম, আকরোট, জলপাই প্রভৃতির স্নৈহিক অংশ ইত্যাদি কতকগুলি খাদ্য আমাশয়েও জীর্ণ হয় না। এবং অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে অন্ত্রমধ্যেও পরিপাক হয় না। ফলতঃ উহারা অত্যন্ত দুষ্পাচ্য। অধিক পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করিলে অপক্ব নিঃসৃত হয়, এবং উহাদিগের আধিক্য হইলে যতক্ষণ উহারা আমাশয়ে থাকে, ততক্ষণ আমাশয়-জীর্য্য অন্যান্য পদার্থের পরিপাকেরও সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত করে।

ডাক্তার বোমেন্টের পরীক্ষানুসারে

		ঘণ্টা।	মিনিট
মেষ, গো ও শূকরমাংস	....	৪	০
পিঙ্গলবর্ণ হংসপ্রভৃতির মাংস	.. ..	৩	৩০
শ্বেতবর্ণ কুক্কুটপ্রভৃতির মাংস	.. ..	৩	০
মৎস্য	.. ..	২	৩০

সময় মধ্যে পাচিত হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, আমাশয়ে স্থিতিকাল অনুসারে খাদ্যের লঘুপাকত্ব ও গুরুপাকত্ব গণনীয় নহে। যে সকল দ্রব্য আমাশয়ে পাচ্য, তাহারা প্রায় তথায় ৩।৪ ঘন্টামধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়। সকল ব্যক্তির আমাশয়িক পরিপাককাল সমান হয় না। নিয়ত অধ্যয়ন-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের শারীরিক পরিশ্রম কিছুই হয় না; ভুক্তদ্রব্য তাহাদিগের আমাশয়ে ৬ ঘন্টা হইতে ৮ ঘন্টাকাল পর্য্যন্ত থাকে। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমেও আমাশয়িক পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। ভোজনের পরক্ষণেই ব্যায়াম বা ভ্রমণাদি অতিশয় শারীরিক পরিশ্রমজনক কর্ম্ম করিলে, অপাক হইয়া থাকে। নিদ্রাকাল অপেক্ষা জাগরিত সময়ে পরিপাকক্রিয়া সত্বর সম্পন্ন হয়।

খাদ্যের প্রকৃতি—খাদ্যদ্রব্য হইতে শরীর রক্ষা হয়। অতএব যে যে পদার্থের দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, খাদ্যেও সেই সেই পদার্থ থাকা অবশ্যই সম্ভবে। মনুষ্যগণ মাংস ও শস্যাদি ভোজন এবং জল, দুগ্ধ, সুরাপ্রভৃতি পান করিয়া থাকেন। ঐ সকল দ্রব্যে তন্নির্ম্মায়ক অপরাপর পদার্থ ভিন্ন লবণ, চূর্ণ, গন্ধক, ফস্ফরস্, লৌহ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য থাকে। শরীরেও ঐ সকল দ্রব্যের অংশ আছে। শরীরের ঐ ঐ অংশের ক্ষতি, ভক্ষ্য দ্রব্যস্থ ঐ ঐ

পদার্থের দ্বারা সম্পূরিত হইয়া থাকে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লবণ আমাদিগের অতিশয় উপকারী। উহাদ্বারা পাচকরস অধিক পরিমাণে নিস্রুত হয়; সুতরাং তদ্দ্বারা পিপাসার উদ্রেক হয়, এবং তন্নিবন্ধন জলপান করিলে পরিপাক কার্য্যের বিশেষ আনুকূল্য হয়। মরীচ, পিপ্পল প্রভৃতি মসল্লা ভোজন করিলেও আমাশয় উত্তেজিত হইয়া তত্রত্য পাচক রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া পাক-কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করে।

খাদ্যদ্রব্য সমূহের আকার ও গুণগত ভূয়িষ্ঠ ভেদ থাকিলেও তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে সকল দ্রব্যে যবক্ষার-জান বায়ু থাকে, তাহারা এক শ্রেণীভুক্ত, এবং যে সকল দ্রব্যে উহা নাই, তাহারা অন্য শ্রেণীর অন্তর্গত। যবক্ষারজান বায়ু বিশিষ্ট সমুদায় খাদ্যে যেমন অঙ্গার অম্লজান ও উদজান বায়ুর ভাগ আছে; তদ্‌বিহীন দ্রব্যেও সেই প্রকার ঐ সকল পদার্থ আছে; কিন্তু যবক্ষারজান বায়ু বিশিষ্ট খাদ্যে শরীরের পোষণ ক্রিয়ার প্রাধান্য লক্ষিত হয় বলিয়া, খাদ্যদ্রব্যে যবক্ষারজান বায়ুর সত্তা ও অভাব দেখিয়া পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে ঐ দুই শ্রেণী নিবিষ্ট করিয়াছেন। যবক্ষারজান বায়ু বিশিষ্ট খা-দ্যের দ্বারা শরীরের ক্ষতিপূরণ ও সম্বর্দ্ধন হয় বলিয়া

উহাকে পৌষ্টিক এবং যবক্ষার বিহীনদ্বারা শারীরিক উত্তাপ জন্মে বলিয়া উহাকে উত্তাপজনক খাদ্য কহে। এই উভয় গুণবিশিষ্ট খাদ্যই আমাদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক। আমিষ ও শস্যাদিতে ঐ উভয় গুণই বিদ্যমান আছে। কিন্তু শস্য অপেক্ষা আমিষে যবক্ষারজান-বিশিষ্টতা ও আমিষ অপেক্ষা শস্যাদিতে যবক্ষার-বিহীনত্ব গুণ অধিক সপ্রমাণ হইয়াছে।

আমিষ ভক্ষ্যের মধ্যে বসাবিহীন মাংস, ডিম্বের মধ্যস্থ শুভ্র পদার্থ; দুগ্ধ পনীর, পেশী, এবং বন্ধনী, পেশীবটী, চর্ম্ম, অন্তস্ত্বক্ ও অস্থি প্রভৃতির ক্বাথ, এবং শস্য সম্বন্ধীয় খাদ্যের মধ্যে শস্যাদির গ্লুটেন্ এবং মটর, সীম, মসূর, প্রভৃতির পানীয় পদার্থ, যবক্ষার-জান-বিশিষ্টতার উদাহরণ। মেদ, নবনীত, মধু এবং শস্যাদির শ্বেতসার, ঘনীভূত নির্য্যাস, দ্রব নির্য্যাস, চিনি প্রভৃতি যবক্ষারজান বিহীনত্বের দৃষ্টান্ত স্থল।

আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত যবক্ষারজান বায়ু নিতান্ত আবশ্যক। উহা আমাদিগের শরীরের একটী উপাদান। উদ্ভিজ্জগণ বাহ্য বায়ু হইতেই যবক্ষারজান বায়ু গ্রহণ করে, কিন্তু জন্তুগণ, নিশ্বসিত বায়ু সহকারে, যবক্ষারজান বায়ু গ্রহণ করিলেও তৎ পরক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং

উপায়ান্তরে, শরীরের সহিত উহার সংযোগ হওয়া আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্য উহার অংশ বিশেষ সংস্থাপিত হওয়ায় সেই উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। আমিষ ও শস্যাদি উভয় প্রকার খাদ্যেই যবক্ষারজান বিশিষ্টতা ও তদ্‌বিহীনতা গুণ আছে। অতএব আমরা যেমত আমিষ আহার করিয়া জীবিত থাকিতে পারি, সেইরূপ নিরামিষ ভোজন দ্বারাও প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হই। কিন্তু আমিষ অপেক্ষা শস্যাদিতে যবক্ষারজান-বিশিষ্টতা গুণ অল্প, এবং যবক্ষারজান-বিশিষ্টতা ও তদ্বিহীনতা উভয়ই আমাদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। অতএব আমিষ ও নিরামিষ এই উভয় প্রকার দ্রব্য ভোজন করিলে শরীরের পোষণ ক্রিয়া যেমত সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হয়, এক প্রকার মাত্র আহার করিলে সেরূপ হয় না। মাংস ও শস্যাদিতে কেবল যবক্ষারজান-বিশিষ্টতা ও তদ্‌বিহীনতা গুণের তারতম্য আছে, কোনটীতে কোন গুণের সম্পূর্ণ অভাব নাই। অতএব, ইচ্ছা হইলে, কুক্কুর প্রভৃতি মাংসাহারী জন্তুদিগকে শস্যাদি খাওয়াইয়া, এবং শস্যাহারী শূকরাদি পশুকে মাংসাহার দিয়া জীবিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু শস্যাদিতে যবক্ষারজান বায়ুর ভাগ অল্প; অতএব শরীর পোষণার্থ আবশ্যক পরিমিত যবক্ষারজান

বায়ুর জন্য মাংস অপেক্ষা অধিক পরিমিত শস্য ভোজন দিতে হয়। আমিষাহারী জন্তু অপেক্ষা শস্যাহারী জন্তু যে অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকে, তাহারও কারণ ঐ। অশ্ব গবাদির শরীর যে পরিমিত ভারী, তাহারা তাহার দশাংশ বা দ্বাদশাংশ ভার পরিমিত দ্রব্য প্রতিদিবস আহার করিয়া থাকে। কিন্তু বিড়াল ও কুক্কুর প্রভৃতি মাংসাহারী জন্তুগণ আপন আপন শরীরের ত্রিংশাংশের একাংশ পরিমিত দ্রব্য ভোজন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। এই জন্যই শস্যাহারী জন্তুদিগের পাকাশয়, মাংসাহারী-দিগের পাকাশয় অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত দেখা গিয়া থাকে। মনুষ্যের পাকাশয় শস্যাহারী ইতরেতর জন্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ও মাংসাহারী জন্তুর পাকাশয় অপেক্ষা বড়। ইহাতেই মনুষ্যেরা যে আমিষ ও নিরামিষ উভয়-প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা বোধ হইতেছে। মনুষ্যের দন্তের গঠন প্রকারেও ঐ যুক্তির পোষকতা করে। উহাদিগের ছেদন ও শ্বদন্ত, মাংসাদ দিগের দন্তের ন্যায়, এবং পেষণ-দন্ত শস্যাশীদিগের দন্তের ন্যায় গঠিত হইয়াছে।

কেবল মাত্র যবক্ষারজান-বিহীন কিংবা যবক্ষারজান-বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর রক্ষা হয়

না। জন্তুদিগকে কেবল মাত্র চিনি, শস্যাদির ঘন নির্যাস ও শ্বেতসার প্রভৃতি যবক্ষারজান বিহীন পদার্থ অথবা ডিম্বের মধ্যস্থ শুভ্র পদার্থ প্রভৃতি যবক্ষারজান-বিশিষ্ট পদার্থ খাওয়াইলে অতি অল্প দিবসেই তাহারা মরিয়া যায়। আবার, কেবল মাত্র একরূপ দ্রব্য ভোজন করা অপেক্ষা নানাবিধ দ্রব্য ভোজনে বিশেষরূপে শরীর পোষিত হয়। শশক প্রভৃতি যে সকল জন্তু নানাপ্রকার দ্রব্য ভোজন করে, তাহাদিগকে কেবল একপ্রকার দ্রব্য মাত্র ভোজন করিতে দিলে, তাহাদিগের ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া প্রাণ নাশ হয়।

পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, খাদ্যদ্রব্যে একভাগ যবক্ষারজান বিশিষ্ট এবং চারিভাগ যবক্ষারজান-বিহীন পদার্থ থাকা আবশ্যক। অতএব, যে খাদ্যে ঐ পদার্থ-দ্বয়ের ঐরূপ ভাগ-পরিমাণের সামঞ্জস্য থাকে, তাহাই শরীর পোষণের নিমিত্ত অধিক উপযুক্ত। মাতৃস্তন্য শিশুদিগের একমাত্র জীবিকা, অতএব তাহাতে প্রকৃত রূপে ঐ পরিমাণ লক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকের স্তন্যে একভাগ পানীয় ও চারিভাগ চিনি ও নবনীত-জনক পদার্থ আছে। পণ্ডিত ম. লিবিগের মতানুসারে পশ্চাৎ লিখিত দ্রব্যাদিতে দশভাগ যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ ধরিলে যে পরি-

মিত যবক্ষারজান বিহীন পদার্থ ধরা যায়, তাহা ঐ ঐ দ্রব্যের সম্মুখস্থ অঙ্কশ্রেণীর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল।

তণ্ডুল ..	১২৩	স্ত্রীলোকের স্তন্য ..	৪০
গোলআলু ..	৮৭	গোদুগ্ধ	৩০
যব	৫৭	বরাহ-মেদ	৩০
ওট্	৫০	মেষ-মেদ, ...	২৭
রাই	৫০	শীম	২২
গোধূম ..	৪৬	মসূর	২১

অন্নের সার সঙ্কলন—শরীরের যে যে অঙ্গ পোষিত হওয়া আবশ্যক, খাদ্য দ্রব্য হইতে তাহা সঙ্কলিত হইয়া তাহার চূর্ণের ভাগ অস্থিতে, মূত্রজনক পদার্থ পেশীতে এবং অন্যান্য ভাগ অপরাপর অংশে সংযোজিত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। এবং এমত অপূর্ব্বরূপে ঐ সংযোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যে শরীরের যে অংশে যে পরিমিত যে পদার্থ আবশ্যক, সেই অংশে সেই পরিমিত সেই পদার্থ সংযোজিত হইয়া কেবল শারীরিক প্রাত্যহিক ক্ষতি পরিপূরিত হয়, এমত নহে, শিশু-দেহের সম্বর্দ্ধন এবং পীড়া বা অন্য কারণে কোন অংশের ক্ষতি হইলে তাহার সম্পূরণ হয়। কোন অঙ্গ পুড়িয়া গেলে বা অস্ত্রাঘাতে কোন স্থানের চর্ম্ম উঠিয়া গেলে, তাহা ক্রমে ক্রমে পূরিয়া উঠে। কিন্তু শরীরের সকল অংশ পুনর্ব্বার

উৎপন্ন হয় না। কোন অঙ্গের অস্থি ভগ্ন হইয়া গেলে ভগ্ন অংশ-দ্বয়ের মধ্যে পুনর্ব্বার অস্থি উৎপন্ন হইয়া উহাদিগকে সংযুক্ত করে। অঙ্গ বিশেষ হইতে এক-খণ্ড অস্থি একবারে নষ্ট হইয়া গেলেও তাহা পুনর্ব্বার জন্মিয়া থাকে। পেশী নষ্ট হইলে আর জন্মে না। উপাস্থি ক্ষয় হইলে সম্পূর্ণ রূপে তাহার ক্ষতি পূরিত হয় না। মস্তিষ্কের ক্ষয় পূর্য্য নহে। স্নায়ু ছিন্ন হইলে সংযুক্ত হয় বটে; কিন্তু কোন স্নায়ুর মধ্যস্থান হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমিত বা তদধিক ভাগ কাটিয়া লইলে ছিন্ন অংশদ্বয় আর মিলিত হয় না। রক্ত-বহ নাড়ীসকল নষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার জন্মিয়া থাকে, নেত্রান্তঃ কাচ-ধর্ম্মী রস নষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়। ফলতঃ দেহস্থ পাকযন্ত্রের এমনি চমৎকারিতা যে, আমরা যত দ্রব্য আহার করি, প্রায় তাহার সমু-দায় ভাগ শরীর পোষণ ক্রিয়ায় নিঃশেষিত হইয়া অতি অল্পভাগ মাত্র মল-রূপে নির্গত হয়। স্বাস্থ্য-সম্পন্ন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভোজনের পর প্রতি-দিবস প্রায় ৵০ ছটাক হইতে ১/০ ছটাক পর্য্যন্ত মল ত্যাগ করিয়া থাকে, ঐ মলের /১০ ছটাক হইতে ৵১০ ছটাক পর্য্যন্ত জল, অবশিষ্ট ভাগ ভক্ষিত দ্রব্যের কঠিন পদার্থ মাত্র।

জল—জল প্রভৃতি পানীয় পাক ক্রিয়ায় অনেক

আনুকূল্য করিয়া থাকে, অম্ল বা ক্ষার-ধর্ম্মাক্রান্ত পানীয় দ্বারা পাচক রসের ন্যায় ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া থাকে। অনেক প্রকার খাদ্যও জল দ্বারা পাচিত হয়। জল শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক। উহার সংযোগে রক্তের আবশ্যক তারল্য সম্পাদিত হয়, এবং শরীরে সর্ব্বপ্রকার রসের শোষণ, স্রবণ, ও বহিঃসরণ হয়। শরীরের সমুদয় অংশ জলসিক্ত না থাকিলে আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না। অঙ্গ সমুদয় জলসিক্ত থাকায় কোমল ও কর্ম্মক্ষম থাকে। জল সঙ্কোচ্য নহে, সুতরাং অঙ্গাদির মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক আয়তন বাহ্য আঘাত দ্বারা সঙ্কুচিত হইতে দেয় না। ফলতঃ জল আমাদিগের অতিশয় উপকারী পদার্থ, তদভাবে অল্প কাল মধ্যেই আমাদিগের জীবন নষ্ট হয়। জীবন রক্ষায় উহার সমধিক আনুকূল্য থাকায় প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উহা জীবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শরীরে শতকরা ৭৭ ভাগ জল আছে। প্রতি-দিবস শরীর হইতে যে জল বহির্গত হয়, পান ভোজন প্রভৃতি দ্বারা তাহা আবার শরীরস্থ হইয়া থাকে। শরীর হইতে প্রায় ২৫০ সের জল প্রতি দিবস নিঃসৃত হইয়া যায়। কিন্তু আমরা অত জল প্রত্যহ পান করি না। পান-ক্রিয়া দ্বারা ও ভক্ষ্য দ্রব্য সংযোগে

যে জল আমাদিগের শরীরস্থ হয়, তাহার পরিমাণ প্রায় ৩ লিন্ট হইবে। সুতরাং পীত ও ভুক্ত দ্রব্য সংযোগে উদরস্থ জল দ্বারা আমাদিগের শরীরের প্রাত্যহিক জলক্ষতি পরিপূরিত হয় না। স্নানাদি ক্রিয়াকালে যে জল গাত্রলগ্ন হয়, এবং বাহ্য বায়ুর সহিত যে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, চর্ম্ম-পথে তাহা শরীরস্থ হইয়া এবং শরীরের মধ্যে উদজান ও অম্লজান বায়ুর সংযোগে জল জন্মিয়া ঐ ক্ষতি পূরণ সমাধা করে। ঋতুবিশেষে ও শরীরের অবস্থা বিশেষে অধিক পরিমিত জল পানের যে আবশ্যকতা হয়, তত্তৎ সময়ে শরীর হইতে ঘর্ম্মাকারে বা মল মূত্র রূপে অধিক পরিমিত জল নিঃসরণ তাহার কারণ।

রক্ত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রক্ত হইতে শরীর পোষিত হয়। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, শরীরে যে যে পদার্থের যে যে ভাগ আছে, রক্তেও সেই সেই পদার্থের সেই সেই ভাগ থাকিবে। বস্তুতঃ তাহাই আছে, রক্তে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জল, এবং অবশিষ্ট ভাগে মেদ, চিনি, শ্বেতসার এবং লাবণ, খনিজ, ও সুত্রজনক প্রভৃতি পদার্থ আছে। ১৫৭ একমণ সাইত্রিশ-সের ভারী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরের জল-ভাগ বাদ দিলে প্রায় ।৬৫৴ ষোল সের তের ছটাক অন্যান্য পদার্থ পাওয়া যায়। ঐরূপ ভারী শরীরে

।০ সের তরল রক্ত থাকে, ঐ তরল রক্তের প্রায় /৭৫ সের জল, অবশিষ্ট /২।০ সের শরীর পোষণোপযোগী কঠিন পদার্থ। অতএব রক্তস্থ /২।০ সের পদার্থ দ্বারা তাহার প্রায় ৮ গুণ অধিক, অর্থাৎ ।৬৫/০ পদার্থের ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে। তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইতেছে যত শীঘ্র শরীরের ক্ষয় হয়, রক্তে তাহা অপেক্ষা প্রায় ৮ গুণ ত্বরাক্রমে পুষ্টিকর পদার্থ সংযোজিত হওয়া আবশ্যক, তদ্ভিন্ন শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, খাদ্য হইতেই রক্তের পোষণী শক্তি জন্মে, এবং খাদ্য গ্রহণের উপযুক্ত সময় ক্ষুধা-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হয়। সুতরাং ক্ষুদ্‌বোধ হইলে উপযুক্ত সামগ্রী ভোজন না করিলে আমাদিগের দেহ ক্ষয় হইতে থাকে।

এইরূপে খাদ্য হইতেই জীবন রক্ষা হইতেছে। বায়ু অভাবে যত ত্বরায় মৃত্যু, উপস্থিত হয়, খাদ্য অভাবে তত শীঘ্র দেহ নাশ না হইলেও তাহাতে ক্রমে ক্রমে বলহ্রাস ও শরীরক্ষয় হইয়া সংহার দশা উপস্থিত হয়। অল্পাহারের ন্যায় অতিভোজন ও অহিতকারী। অতিভোজন দ্বারা পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়া পীড়া জন্মে। অতএব, প্রতিদিবস শরীর পোষণোপযুক্ত নিয়মিত সামগ্রী ভোজন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতি-ভোজন বা অল্প-ভোজন দ্বারা

এই নিয়মের, অন্যথাচরণ করিলেই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

ত্বক্

ত্বক্ দ্বারা আমাদিগের সমুদায় শরীর আচ্ছাদিত আছে। উহা দ্বারা শরীরের কোমল পদার্থ-গুলি বাহ্য আঘাত হইতে রক্ষিত হয়; বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ-সাধ্য জ্ঞান জন্মে; শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, বহিঃস্থ জল, বায়ু প্রভৃতি শরীরে প্রবিষ্ট হয়; এবং শারীরিক উত্তাপ রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব, ত্বক্ আমাদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শরীরের অন্তর্ ও বাহির্, উভয় ভাগই ত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত আছে; কিন্তু উহার যে অংশদ্বারা শরীরের বহির্ভাগ আচ্ছাদিত, তাহাকে ত্বক্ বা চর্ম্ম কহে, এবং যে ভাগ দ্বারা অন্তর্দ্দেশ আবৃত, তাহা হইতে অনবরত একপ্রকার রস নির্গত হয় বলিয়া, তাহাকে শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্ কহে। ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে; কেবল গুণের ও কার্য্যের

ভিন্নতা অনুসারে ঐ উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বয়স্, স্ত্রী পুরুষ জাতি ভেদ, ও আকার ভেদে ত্বকের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ড্যাংসাপি, কোন দীর্ঘকায় ৪৫ বৎসর-বয়স্ক ব্যক্তির ত্বক্ ২০০০ বর্গ ইঞ্চ্ পরিমাণ করিয়াছিলেন।

ত্বকের গঠন প্রণালী—ত্বক্ তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পর্দ্দায় রচিত—বহিস্ত্বক্, মধ্যত্বক বা প্রকৃত চর্ম্ম ও অধস্ত্বক্।

বহিস্ত্বক্ শ্বেতবর্ণ ও অল্পস্বচ্ছ। উহাতে অনেক গুলি স্তর আছে। ঐ সকল স্তর ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঐ ত্বকের অন্তর্দ্দেশে নূতন নূতন স্তর জন্মিতে থাকে, এবং বহির্দ্দেশস্থ স্তরগুলি ক্রমেৎ উঠিয়া যায়। যখন বহির্দেশ হইতে স্তর উঠিতে না পারে, তখন অন্তর্দ্দেশে নূতন নূতন স্তর জন্মিয়া বহিস্ত্বক্ পুরু হইয়া উঠে। এইরূপে স্তর পুরু হইয়া অঙ্গবিশেষে ঘাঁটা পড়িয়া থাকে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহিস্ত্বকের উপরি হইতে স্তর উঠিয়া উহা পাতলা হইয়া যায়। বহিস্ত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্খ্য রন্ধ্র ও গহ্বর আছে। উহাতে কোন প্রকার নাড়ী বা স্নায়ু নাই এবং উহা অনুভাবকতা শক্তি বিহীন। শরীরে ব্লিষ্টার অর্থাৎ ফোস্কাজনক মলম

দিলে ফোস্কা হইয়া ত্বকের যে ভাগ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহাই বহিস্ত্বক। সর্পাদি জন্তুগণ সময়ে সময়ে বহিস্ত্বক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা হইতেই শরীরের লোম উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার গহ্বর-নিচয়ে সর্ব্বদা একপ্রকার রস বিদ্যমান থাকে। তাহারই বর্ণানুসারে শরীরের বর্ণ হইয়া থাকে। ঐ রস আফ্রিকদিগের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ, আমেরিকদিগের গাত্রে লালবর্ণ, মালয়জাতিদিগের শরীরে পীত বা পিঙ্গলবর্ণ, এবং ইয়ুরোপীয়দিগের গাত্রে গৌরবর্ণ লক্ষিত হয়। ঐ রসের উপরি বহিস্ত্বকের যে স্তর থাকে, তাহার স্বচ্ছতা প্রযুক্ত উহার বর্ণ অনায়াসে লক্ষিত হয়।

ভেদাবরোধক কতকগুলি সূক্ষ্ম সূত্র জালবৎ উত হইয়া মধ্যত্বক উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যত্বক্ অসঙ্খ্য-রক্ত ও লসীকাবহ নাড়ী এবং স্নায়ুদ্বারা পরিব্যাপ্ত; এবং উহার বহির্দ্দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্ছ্রায় বিশেষদ্বারা নিবিড়রূপে আকীর্ণ। ঐ সকল উচ্ছ্রায়ের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও মূলদেশ স্থূল। উহারা এত সূক্ষ্ম ও নিবিড় যে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে পাঁচ সহস্র হইতে দশ সহস্র উচ্ছ্রায়ের স্থিতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মধ্যত্বকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাংসগ্রন্থি আছে। তাহা হইতে বসাবৎ একপ্রকার রস নির্গত হয়;

এই নিমিত্ত উহাদিগকে বসাস্রবণ গ্রন্থি কহে। ঐ সকল গ্রন্থি হইতে লোমকূপে বসা নিস্রুত হইয়া থাকে।

অধস্ত্বক্ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরময় ও বসাকীর্ণ। উহাতেও বহুল সূক্ষ্মতর মাংসগ্রন্থি আছে। ঐ সকল গ্রন্থিদ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়; এই নিমিত্ত উহারা ঘর্ম্ম-স্রবণ গ্রন্থিশব্দে নির্দ্দিষ্ট। ঘর্ম্ম-স্রবণ প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে এক একটী ঘর্ম্মবহ প্রণালী উদ্‌গত হইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যত্বক্ ভেদ করিয়া স্ক্রুর আকারে বহিস্ত্বকের মধ্যদিয়া তাহার বহিঃসীমায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

চর্ম্মের কার্য্যকারিতা—উপরিস্থ লিখনানুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে, চর্ম্মের ঘনত্ব, ভেদাবরোধকত্ব, সৌত্রিকত্ব ও সচ্ছিদ্রতা প্রভৃতি গুণ আছে। তদ্ভিন্ন চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা, অল্পতাপ-পরিচালকতা প্রভৃতি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গুণ থাকাতেই উহা শরীর-রক্ষোপযোগী হইয়াছে। উহা ঘন, ভেদাবরোধক, সৌত্রিক ও স্থিতিস্থাপক বলিয়া তদধঃস্থ কোমল পদার্থ-গুলি বাহ্য আঘাত হইতে রক্ষা পায়। বহিস্ত্বক্ অনুভাবকতা শক্তিবিহীন ও উহাতে কোনপ্রকার নাড়ী বা স্নায়ু নাই, অতএব, উহা, রক্ত ও লসীকাবহ নাড়ী এবং স্নায়ুসম্পন্ন মধ্যত্বকের উপরিভাগে থাকিয়া ঐ সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী

ও স্নায়ুদিগকে বাহ্য শৈত্য ও উত্তাপযোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে দেয় না; এবং আমরা সর্ব্বদা যে সকল নানাবিধ বিষময় পদার্থ স্পর্শ করিতেছি, তাহার সংস্পর্শে মধ্যত্বকস্থ রক্তবহ নাড়ীর রক্ত বিষাক্ত হইতে পারে না। গাত্রস্পৃষ্ট যে সকল বিষ রাসায়নিক কার্য্যবিশেষদ্বারা শরীরস্থ হয়, তদ্ভিন্ন অপর কোন বিষ গাত্রে লাগিলে বহিস্ত্বকের গুণে আমাদিগের অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে না।

চর্ম্মের তাপ-পরিচালকতা শক্তি অল্প হওয়ায় আমাদিগের শরীরে সর্ব্বক্ষণ যে তাপ জন্মিতেছে, তাহা অধিক পরিমাণে শরীর হইতে বহির্গত হইতে পারে না; তাহাতেই শরীরের আবশ্যক উত্তাপ রক্ষা পায়। অচেতন পদার্থ সকল যে স্থানে থাকে, তত্রত্য বায়ুর তাপাংশ অনুসারে তাহারা উত্তপ্ত হয়, কিন্তু জন্তুগণের পক্ষে সে নিয়ম নহে। মনুষ্য শীত-প্রধান দেশেই অবস্থিতি করুন, বা উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করুন, স্বাস্থ্যাবস্থায় প্রায় সকলেরই গাত্র-তাপ সমান থাকে এবং ঐ উত্তাপ বাহ্য বায়ুর তাপাংশ হইতে অনেক অধিক। শরীরমধ্যে অনুক্ষণ উত্তাপ জন্মিবার বিধান থাকায় ও চর্ম্মের তাপ-পরিচালকতা শক্তি অল্পবিধায় আমাদিগের শরীরে ঐরূপ তাপ বিদ্যমান থাকে।

চর্ম্মের সচ্ছিদ্রতাগুণ থাকায় শরীরস্থ দূষিত পদার্থ চর্ম্মপথে বহির্গত হইয়া যায়, এবং বহিঃস্থ জল বায়ু প্রভৃতি শরীরস্থ হইতে পারে। চর্ম্মপথে শরীর হইতে যে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে, তাহা রক্তস্থ দূষিত পদার্থ; এইজন্য কামলা ও পাণ্ডুরোগীদিগের ঘর্ম্ম পীতবর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীদিগের ঘর্ম্ম মূত্রধর্ম্মী এবং বাত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। অতএব ঘর্ম্ম-নিঃসরণের উপায় বিধান থাকায় আমাদিগের ভূয়িষ্ঠ উপকার হইয়াছে। কিন্তু শরীর হইতে অধিক পরিমিত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে, আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব, তৎপ্রতিবিধানার্থে উহার সচ্ছিদ্রতা গুণ থাকিলেও অন্তশ্চারকতা গুণ অতিঅল্প আছে। তাহাতেই অধিক পরিমিত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া রক্তের ক্ষয় ও শরীরের বিনাশ করিতে পারে না। শরীর হইতে অনবরতই চর্ম্মগত ছিদ্র দিয়া নষ্টপদার্থ সকল বহির্গত হইতেছে, কোন ক্রমে উহার নিঃসরণ পথ অবরুদ্ধ হইলেই আমাদিগের নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। এই-হেতু, সর্ব্বদা গাত্র পরিষ্কার ও পরিমার্জ্জনা করা আবশ্যক, এবং দিবসে ২।৩ বার বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত। যখন অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে, তখন সহসা শীতল জলে স্নান বা শীতল জল

পান এবং নিতান্ত শীতল স্থানে উপবেশন করা উচিত নহে। তাহাতে সহসা শীতপ্রভাবে চর্ম্ম সঙ্কুচিত এবং ঘর্ম্মবহ প্রণালীর স্বেদ-নিঃসরণ পথ অপ্রসারিত অথবা রুদ্ধ হইয়া যায়। অন্যান্য তরল পদার্থের ন্যায় ঘর্ম্মও অসংকোচ্য; সুতরাং ঘর্ম্মবহ প্রণালী-গত নিঃসরণোন্মুখ ঘর্ম্ম সঙ্কুচিত হইতে না পারিয়া ঘর্ম্মস্রবণ গ্রন্থিতে উল্টিয়া যায়, এবং তথা হইতে রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাতেই ঘর্ম্ম নিঃসরণ রুদ্ধ হইলে পীড়া হইয়া থাকে। যেমন চর্ম্মপথে স্বেদ ও বাস্পের আকারে শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, সেইরূপ শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বকদ্বারাও অনেক নষ্ট পদার্থ নিঃসৃত হয়। কিন্তু চর্ম্ম অপেক্ষা শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বকের স্থূলতা অল্প ও সচ্ছিদ্রতা অধিক, এইহেতু চর্ম্ম অপেক্ষা তৎপথে অধিক পরিমাণে দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে।

চর্ম্মের অন্তর্দ্দেশ স্পর্শজ্ঞানজননী-স্নায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত আছে। অতএব, কোন বাহ্য পদার্থ চর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলেই আমাদিগের তদ্বিষয়ের স্পর্শসাধ্য জ্ঞান জন্মে। কিন্তু স্নায়ুকীর্ণ মধ্যত্বক্‌ বহিস্ত্বকে আচ্ছাদিত; বহিস্ত্বক্‌ সকল স্থানে সমান পুরু নহে; সুতরাং তাহার স্থূলতা অনুসারে ও বাহ্যপদার্থের

স্পর্শ-বেগানুসারে স্থানবিশেষে ঐ জ্ঞান অধিক বা অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

নবম অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়।

যদ্দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ইন্দ্রিয় কহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়ে পাঁচটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। এই সমুদায় ইন্দ্রিয় রচনা ও শরীরের যথোপযুক্ত স্থানে তাহাদিগের নিবেশ-কৌশল চিন্তা করিয়া তদ্রচয়িতার ও স্থাপয়িতার অসীম জ্ঞান-শালিত্ব ও করুণার শত শত ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষণকালও স্থির থাকা যায় না।

ইন্দ্রিয় সমুদায় এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা বাহ্য বিষয়ের বিশেষ বিশেষ গুণ উপলব্ধি হইয়া তাহা-দিগের সত্তা জ্ঞান জন্মে। প্রত্যেক্ ইন্দ্রিয়স্থলে কতকগুলি জ্ঞান-জননী স্নায়ু ব্যাপ্ত আছে। বাহ্য বিষয় দ্বারা সেই সকল স্নায়ুর ভাবান্তর বিশেষ উপ-স্থিত হইলেই তত্তৎ ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান জন্মে। যেমন বাহ্য বিষয়ক জ্ঞানজনন জন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে কতক-গুলি স্নায়ু আছে, সেইরূপ, সেই সকল স্নায়ু সংরক্ষণ

ও যথোচিতরূপে জ্ঞানজনন ক্রিয়া নিয়মিত করিবার জন্য তত্তৎ স্থলে তাহার উপায় বিধান আছে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে যে ইন্দ্রিয় যুগ্ম যুগ্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদিগের এক এক যুগ্মের উভয়টী শরীরের উভয় পার্শ্বে সমান স্থানে সমান কার্য্যের নিমিত্ত সমান রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। যেটী যুগ্ম নহে সেটীও শরীরের উভয় ভাগে অর্দ্ধার্দ্ধি হইয়া আছে। চারিটী ইন্দ্রিয় আমাদিগের মস্তকে মস্তিষ্কের সহিত সন্নিকৃষ্ট রূপে সংস্থিত হইয়াছে। স্বাদেন্দ্রিয়, খাদ্য প্রবেশ দ্বারে প্রহরীস্বরূপ অবস্থিত থাকিয়া সুস্বাদ ও স্বাস্থ্যকর সামগ্রী গ্রহণ এবং বিস্বাদ ও পীড়াকর দ্রব্যের প্রবেশ নিবারণ করিতেছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্বসিত বায়ুর উপকারিতা অনুপকারিতা জানাইবার জন্য বায়ুপ্রবেশদ্বারে সংস্থিত হইয়া স্বাস্থ্যকর বায়ুর প্রবেশ অনুমোদন এবং পীড়াকর বায়ু প্রবেশে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সম্মুখস্থ সমুদায় পদার্থের অনায়াস দর্শন জন্য চক্ষুর্দ্বয় মস্তকের সম্মুখভাগে থাকিয়া অদর্শন-ফলিত কত প্রকার বিপদ্ নিবারণ করিতেছে। আমাদিগের উভয় পার্শ্বের সমুদায় সংবাদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কর্ণদ্বয় মস্তকের উভয় দিকে সংস্থাপিত হইয়াছে। এবং শরীরের যে কোন ভাগে যে কোন দ্রব্য স্পর্শ করুক, তাহা জানা-

ইয়া দিবার জন্য স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ জগদীশ্বরের পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা ইহারা যে যে স্থানে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইলেই আমাদিগের মহানর্থ ঘটিত।

উপরি লিখিতানুসারে প্রতিপন্ন হইবে, স্বাদেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় খাদ্যের ও বায়ুর গুণাগুণ বিচার করিয়া আমাদিগের শরীর পোষণ-কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল বাহ্য পদার্থের জ্ঞানজনন নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। উহাদিগের দ্বারা শরীর রক্ষা বিষয়ে তাদৃশ আনুকূল্য হয় না। এই নিমিত্ত, দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলেও রসন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রায় আজীবন অব্যাহত থাকে।

স্পর্শেন্দ্রিয়—ত্বক্‌কে স্পর্শেন্দ্রিয় কহে। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, আমাদিগের শরীরের অন্তর ও বাহির, সমুদায় স্থান ত্বক্‌দ্বারা আবৃত। এবং ঐ ত্বক্ অসঙ্খ্য জ্ঞানজননী স্নায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত, ঐ সকল স্নায়ু ক্রমে ক্রমে মিলিত হইয়া মেরুদণ্ডগত মজ্জাপথে অথবা করোটী-রন্ধ্র দিয়া মস্তিষ্কে মিলিত হইয়াছে। অতএব শরীরের প্রায় সমুদায় ভাগেই স্পর্শজ্ঞান জন্মে। বাহ্যপদার্থ ঐ স্নায়ু সংস্পৃষ্ট হইলেই তদ্বিষয়ের জ্ঞান ঐ সকল স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে সমুপস্থিত হয়।

কিন্তু বাহ্য পদার্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ সকল স্নায়ুকে সংস্পর্শ করে না। স্পর্শজ্ঞানজননী স্নায়ু মধ্যত্বকস্থ উচ্ছ্রায়-নিচয় ব্যাপিয়া আছে, অতএব বহিস্ত্বক, বাহ্য-পদার্থ ও মধ্যত্বকস্থ উচ্ছ্রায় নিচয়, এই উভয়ের অন্তরীণ থাকে। বহিস্ত্বক্ ঐরূপে অবস্থিত থাকাতে মধ্যত্বকস্থ উচ্ছ্রায় সকল বাহ্য আঘাত হইতে রক্ষিত ও স্পর্শজ্ঞান নিয়মিত হইয়া থাকে। বহিস্ত্বক্ উঠাইয়া ফেলিলে বাহ্য পদার্থ স্পর্শে ঐ সকল উচ্ছ্রায় দ্বারা যথোচিত স্পর্শজ্ঞান না জন্মিয়া বরং কষ্টানুভব হয়। ফোস্কাজনক ঔষধদ্বারা যে স্থানের বহিস্ত্বক্ উঠাইয়া ফেলা যায়, সেই স্থানে হস্তাদি স্পর্শ করিলে কেবল কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ বহিস্ত্বক বিহীন উচ্ছ্রায় দ্বারা নিয়মিত স্পর্শজ্ঞান জন্মিবার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয়।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যকালে অঙ্গবিশেষের বহিস্ত্বক্ ঘর্ষিত হইয়া থাকে। সেই সকল কার্য্যকালে বহিস্ত্বক্ উঠিয়া গেলে আমাদিগের ক্লেশ ও কার্য্য-সম্পাদ্নে ব্যাঘাত হইতে পারে। কিন্তু জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য করুণা যে, শরীরের কোন স্থান বারম্বার ঘর্ষিত ও নিপীড়িত হইলে সেই স্থানের বহিস্ত্বকের উপরিস্থ স্তর উঠিতে না পারায় উহা ক্রমে২ স্থূল হইয়া থাকে। সূত্রধর, কর্ম্মকার, কৃষক প্রভৃতি যে সকল

ব্যক্তি হস্ততল দ্বারা অস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, তাহাদিগের হস্তচর্ম্ম ক্রমশঃ স্থূল হইয়া উঠে। আমরা অপরিসর উপানহ ব্যবহার করিলে পদ কিণাঙ্কিত হইয়া থাকে। খালি পায়ে বেড়াইলে পদতলের চর্ম্ম পুরু হয়।

শরীরের সকল স্থানে সমান স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। স্পর্শজ্ঞান-জননী স্নায়ুর বহুলতা, সেই সকল স্নায়ুর সহিত মস্তিষ্কের সংযোগের অব্যাহতি, এবং তদুপরিস্থ বহিস্ত্বকের স্থূলতা অনুসারে স্থানবিশেষে স্পর্শজ্ঞান-জননের তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ শরীরের যে স্থানে অধিক পরিমাণে স্নায়ু এবং সেই সকল স্নায়ু মস্তিষ্কের সহিত অব্যাহত রূপে সংযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত অস্থূল বহিস্ত্বক্ দ্বারা আবৃত আছে, সেই স্থানেই সমধিক রূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মে; অন্যত্র তাদৃশ জন্মে না।

সর্ব্বাপেক্ষা করতল দ্বারা সহজে স্পর্শজ্ঞান জন্মে। কর-তলে কেবল স্নায়ু-বাহুল্য আছে, এমত নহে, তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি সহজে ধারণ করিতে পারা যায় বলিয়া উহা স্পর্শজ্ঞান-জননের প্রধান সাধন। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, বাহু পাদের শেষ সীমা হইতে যে স্থান মধ্যকায়ের যত নিকটবর্ত্তী, সেই স্থানে তত অল্প স্পর্শজ্ঞান জন্মে। করতল অপেক্ষা

প্রকোষ্ঠের এবং প্রকোষ্ঠ অপেক্ষা প্রগণ্ডের জ্ঞানজনকতা শক্তি অল্প। সেইরূপ পদ অপেক্ষা জঙ্ঘা এবং জঙ্ঘা অপেক্ষা উরুর অনুভাবকতা শক্তি ম্লান। আবার করতল, প্রকোষ্ঠ, এবং প্রগণ্ড অপেক্ষা পদ, জঙ্ঘা, ও উরুদেশে অল্প পরিমাণে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এবং করতল অপেক্ষা করপৃষ্ঠে ও পদপৃষ্ঠ অপেক্ষা পদতলে ঐ জ্ঞানজননের ম্লানতা দেখা যায়। জিহ্বার সীমাদেশে স্পর্শজ্ঞান-জনকতা শক্তি অতিশয় প্রবল। পাকাশয়ের গাত্রগত শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বকে স্পর্শজ্ঞানজনকতা শক্তি নাই।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আকার, গঠন, ভার, কোমলত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য, ও উষ্ণতা অনুভূত হয়। আমরা কোন বস্তু স্পর্শ করিবামাত্র, উহা গোল কি চতুষ্কোণ, বন্ধুর কি মসৃণ, তীক্ষ্ণ কি স্থূলধার, ভারী কি লঘু, কঠিন কি কোমল, শীতল কি উষ্ণ জানিতে পারিয়া থাকি। এই সকল জ্ঞান, বস্তুগত কোমলত্ব, কঠিনত্ব, বন্ধুরতা, মসৃণতা প্রভৃতি গুণের পরস্পর-সম্বন্ধ-সাপেক্ষ হইয়া উদিত হয়। অর্থাৎ আমরা এক বস্তুকে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাহা অপেক্ষা কঠিন বা কোমল, ভারী বা লঘু ইত্যাদি বোধ করিয়া থাকি। যদি সকল বস্তুই একাকার ও অন্যান্য গুণবিষয়েও একরূপ হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ঐরূপ ভেদজ্ঞান জন্মিত না।

দ্রব্যের শৈত্য ও উষ্ণতা যেমন তদ্গত ঐ ঐ গুণের সম্বন্ধাধীন অনুভূত হয়, সেইরূপ আমাদিগের শরীরগত শৈত্য ও উষ্ণতা দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। যে বস্তু আমাদিগের শরীর অপেক্ষা উষ্ণ, তাহা আমাদিগের উষ্ণ বোধ হয়; এবং যাহা শরীর অপেক্ষা অল্প উষ্ণ, তাহা শীতল অনুভূত হয়। যদি কোন উপায়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ উষ্ণতা রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে এক বস্তু সেই সকল স্থানে স্পৃষ্ট হইলে, কোন স্থানে শীতল, কোন স্থানে উষ্ণ বোধ হইয়া থাকে।

অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা স্পর্শেন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান ভ্রমশূন্য ও নিশ্চিত। অন্য ইন্দ্রিয়ে ভ্রম উপস্থিত হইলে আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা দূরীভূত করিয়া থাকি। আমরা চক্ষুদ্বারা কোন অবাস্তব পদার্থ নিরীক্ষণ করিলে, তাহা বাস্তবিক কোন পদার্থ কি না, স্পর্শ করিয়া জানিতে অভিলাষ করি। অন্ধকার বা জ্যোৎস্নাময়ী নিশায় লোকে যে কখন কখন বিভীষিকা-জনক অনৈসর্গিক আকার অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তাহা দর্শন ইন্দ্রিয়ের ভ্রমজন্য ঘটিয়া থাকে। তাদৃশ আকৃতি কখনই স্পর্শলভ্য হয় নাই।

দশম অধ্যায়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

নাসা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আধার। নাসিকা শ্বসিত বায়ুর প্রবেশ দ্বার ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আধার হওয়ায় আমাদিগের কত উপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, শ্বাস ক্রিয়া দ্বারা নির্ম্মল বায়ু শরীরস্থ হইয়া আমাদিগের জীবন রক্ষা হয়; কোন ক্রমে দূষিত বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে দূষিত বায়ু শরীরস্থ না হয়, তাহার বিধান থাকা আবশ্যক। জগদীশ্বর নাসাকে শ্বসিত বায়ুর প্রবেশদ্বার ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আধার করিয়া সেই উপায় করিয়া দিয়াছেন। বায়ু নাসাদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহার গুণাগুণের পরিচয় প্রদান করিয়া অনিষ্টকর বায়ু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দেয়।

নাসিকা একটি পর্দ্দা দ্বারা দুই সমান ভাগে বিভক্ত —ঐ ভাগদ্বয়কে নাসারন্ধ্র কহে। দুইটি নাসারন্ধ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী পর্দ্দাটি সমপৃষ্ঠ ও ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত এবং উহার বহির্বেষ্টন দ্বয় অসমপৃষ্ঠ ও খিলানাকার ৩ খানি বক্র অস্থি দ্বারা গঠিত। নাসার গঠন প্রণালী

এই রূপ হওয়াতেই অল্পস্থান অধিকার করিয়া উহার অধিক ভাগ বায়ু স্পৃষ্ট হইতে পারে। নানারন্ধ্রের অন্তর্দ্দেশ সূত্রময় ত্বক্ বিশেষে আবৃত আছে। ঐ ত্বকের গাত্র সর্ব্বদা এক প্রকার রস-সংযোগে আর্দ্র থাকে, ঐ রসকে শিঙ্ঘাণ কহে; এই নিমিত্ত ঐ ত্বক্‌কে শৈঙ্ঘাণ ত্বক্ শব্দে নির্দ্দেশ করা গেল। শৈঙ্ঘাণ ত্বক্‌ একপ্রকার মাংসগ্রন্থি আছে, তাহা হইতেই ঐ রস নিস্রুত হইয়া উহার গাত্র আর্দ্র রাখে। যে মাংস-গ্রন্থি দ্বারা ঐ রস নিস্রুত হয়, তাহাকে শিঙ্ঘাণ স্রবণ-গ্রন্থি কহে। শৈঙ্ঘাণ ত্বকে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত ঘ্রাণ-জ্ঞানজননী স্নায়ুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র ব্যাপ্ত আছে। তদ্ভিন্ন উহাতে স্পর্শজ্ঞানজননী স্নায়ুসূত্রও অনেক আছে।

গন্ধবিশিষ্ট পরমাণু সকল শৈঙ্ঘাণ ত্বক্ লগ্ন হইলে তদ্‌গাত্রগত রসে দ্রব হইয়া ঘ্রাণীয় স্নায়ু চেতিত করে, তাহাতেই ঘ্রাণজ্ঞান জন্মে। সকল বস্তুর গন্ধ পাওয়া যায় না। কোন কোন বস্তু হইতে নিয়তই একপ্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু উড্ডীন হয়; সেই সকল উড্ডয়-মান পরমাণু নাসারন্ধ্র সংস্পর্শ করিলেই আমাদিগের সেই সেই বস্তুর ঘ্রাণ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু যে বস্তুর পরমাণু নাসারন্ধ্রে উপস্থিত হয়, সেই বস্তুরই গন্ধ পাওয়া যায়, এমত নহে। এমত অনেক পদার্থ

আছে, যাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু নাসা-স্পৃষ্ট হইলেও তাহার গন্ধ পাওয়া যায় না। অনুক্ষণ যে বায়ু নাসা-পথ দিয়া আমাদিগের শরীরস্থ হইতেছে, তাহার কোন গন্ধই নাই; তবে মধ্যে মধ্যে তাহাতে যে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা দ্রব্যান্তর সংযোগে ঘটিয়া থাকে। আবার, ধাতু দ্রব্য হইতে কোন প্রকার পরমাণু উড্ডীন হইতেছে, এমত বোধ হয় না, তথাচ তাহাতে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। লৌহকর বা কাংস্যবণিকদিগের কর্ম্মালয়ে এক প্রকার ধাতু-গন্ধ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এমতও অনেক বস্তু আছে, যাহা চূর্ণ করিয়া নস্য করিলেও তাহার গন্ধ অনুভূত হয় না; তৎ সংস্পর্শে নাসাগত স্পর্শ-জ্ঞান-জননী স্নায়ু চেতিত হয় মাত্র; ঘ্রাণস্নায়ুর চৈতন্য হয় না। ফলতঃ বস্তুর গন্ধবহ পরমাণুর প্রকৃতি কি রূপ ও তাহা কত সূক্ষ্ম তাহার কিছুই স্থির হয় নাই।

এমত অনেক দ্রব্য আছে, যাহার অতি সূক্ষ্মাংশে প্রশস্ত গৃহাদি গন্ধপূর্ণ হয়, অথচ তাহার কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। কথিত আছে, কোন প্রশস্ত গৃহ অর্দ্ধ রতি প্রমাণ মৃগনাভির গন্ধে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত আমোদিত ছিল, তথাচ তাহার যে কিছু ক্ষয় হইয়াছিল, এমত বোধ হয় নাই। ঐ বিংশতি বৎসরাত্মক কাল মৃগনাভি হইতে গন্ধবহ-

পরমাণু উড্ডীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা এত সূক্ষ্ম যে তাহাতে তাহার অনুভাব্য হ্রাস সম্পাদন করিতে পারে নাই। আমাদিগের বস্ত্রাদিতে বিন্দুমাত্র আতর লাগিলে ১০।১৫ দিবস তাহার গন্ধ থাকে; কিন্তু তাহার কোন স্থলে যে আতর আছে, তাহা দেখিয়া স্থির করা যায় না। ফলতঃ যে সকল পরমাণুদ্বারা গন্ধ অনুভব হয়, তাহারা অতীব সূক্ষ্ম।

সকল বস্তু সমান পরিমাণে গন্ধিত হয় না। যে সকল বস্তু বহুচ্ছিদ্রযুক্ত তাহারাই বিশেষ রূপে গন্ধিত হয়। ঐ সকল বস্তুর ছিদ্র গন্ধবহ-পরমাণু বিশিষ্ট থাকায় উহা গন্ধময় থাকে। আবার যে সকল বস্তু তরলতা প্রযুক্ত বায়ুর সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহাও অধিক কাল গন্ধিত থাকে। বস্ত্র, জল, ও কাষ্ঠ প্রভৃতি পদার্থে আতর লাগিলে বা কিছু কাল কোন সুগন্ধ পুষ্প থাকিলে তাহাতে দীর্ঘ কাল সেই আতরের বা পুষ্পের গন্ধ বিদ্যমান থাকে। তিলাদি দ্রব্য কতিপয় দিবস পুষ্প-সংযোগে রাখিয়া তাহার তৈল প্রস্তুত করিলে তাহাতে পুষ্প-গন্ধ অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে, এক খণ্ড কাচে কোন সুগন্ধ পুষ্প কিয়ৎকাল রাখিয়া তুলিয়া ফেলিলে, উহাতে আর পুষ্পগন্ধ পাওয়া যায় না।

একপ্রকার গন্ধ বারম্বার আঘ্রাত হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিস্তেজ হইয়া যায়। যিনি পুষ্পোদ্যানে সতত বিচরণ করেন, তাঁহার অপেক্ষা ক্ষণবিহারী ব্যক্তির পুষ্পগন্ধ অধিক অনুভূত হয়। আমরা সম্মুখস্থিত কোন সুগন্ধ দ্রব্যের গন্ধ প্রথমে যেরূপ অনুভব করি, ক্রমশঃ আর সেরূপ অনুভূত হয় না। যাহারা দুর্গন্ধময় স্থানে সতত অবস্থান করে, তাহাদিগের সেই স্থানকে দুর্গন্ধময় বলিয়া বোধ হয় না। যাহারা পলাণ্ডু, হিং প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করে, তাহারা তাহার গন্ধ অনাঘ্রেয় বিবেচনা করে না; কিন্তু অন্যের নিকট তাহা দুর্গন্ধময় বোধ হয়। যে সকল ব্যক্তির মুখে দুর্গন্ধ থাকে, তাহারা স্বয়ং তাহা অনুভব করে না।

সকলের গন্ধানুভাবকতা শক্তি সমান নহে। ঘ্রাণীয় স্নায়ুর অবস্থা-ভেদে ঐ শক্তির ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। যে বস্তু এক ব্যক্তি সগন্ধ বোধ করে, অন্যের নিকট তাহা নির্গন্ধ প্রতীয়মান হয়। কেহ কোন পুষ্পের গন্ধ অনুভব করেন, কেহ তাহাতে কোন গন্ধই পান না। আবার, যে বস্তু এক ব্যক্তির নিকট সুরভিময় বিবেচিত হয়, অন্যে তাহা দুরাঘ্রেয় বোধ করে। হিং পলাণ্ডু প্রভৃতি কেহ সাহ্লাদচিত্তে ভোজন করে, কাহারও তাহার গন্ধে বমন-চেষ্টা হয়।

এক ব্যক্তিরও ঘ্রাণস্নায়ুর অবস্থা-ভেদে, কোন বস্তু এক সময়ে সুগন্ধ অন্য সময়ে দুর্গন্ধ বোধ হয়। জ্বরাদি রোগে অনেক সুগন্ধ দ্রব্য দুর্গন্ধ বোধ হয়। কফ লাগিলে অনেক বস্তুর কোন গন্ধই পাওয়া যায় না।

মনুষ্য অপেক্ষা অনেক ইতর জন্তুর ঘ্রাণশক্তি প্রবল। কুক্কুরেরা, যে পথে স্বীয় প্রভু গমন করিয়াছে, আঘ্রাণদ্বারা তাহা চিনিয়া লইতে পারে। ব্যাঘ্রাদি স্বীকারী-জন্তুগণ গন্ধানুভব করিয়া আপন আপন ভক্ষ্যের অনুসন্ধান করিয়া লয়। ফলতঃ যাহার যে ইন্দ্রিয়-শক্তি যত প্রবল হওয়া আবশ্যক, করুণাময় পরমেশ্বর তাহার সেই শক্তি তত প্রবল করিয়া দিয়াছেন। স্বীকারী জন্তুগণ আপনাপন ভক্ষ্য জন্তুদিগকে সম্মুখে দেখিতে পায় না, তাহারা সর্ব্বদা তাহাদিগের ভয়ে পলায়িত থাকে; সুতরাং ঘ্রাণশক্তি প্রবল না হইলে তাহাদিগের শরীর ধারণ দুঃসাধ্য হয় বলিয়া তাহাদিগের সেই শক্তি অত প্রবল হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়।

রসনেন্দ্রিয়।

রসনেন্দ্রিয় দ্বারা ভক্ষ্য দ্রব্যের স্বাদ জ্ঞান জন্মে। ভক্ষ্য দ্রব্য চর্ব্বণ-কালে তাহার পরমাণু সকল লালায় দ্রব হইয়া রসন-স্নায়ু চেতিত করিলেই সেই দ্রব্যের স্বাদ বোধ হয়। যেমন ঘর্ম্মস্রবণ-গ্রন্থি দ্বারা ঘর্ম্ম নিস্রুত হইয়া চর্ম্ম আর্দ্র থাকে, নাসারন্ধ্র শিঙ্ঘাণ-স্রবণ গ্রন্থি নিস্রবে রসাক্ত হয়, সেইরূপ লালাস্রবণ গ্রন্থিস্রুত লালা দ্বারা মুখগহ্বর অনবরতই সরস রহিয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-স্থলেই এক এক প্রকার মাংসগ্রন্থি হইতে নিয়তই রস বিশেষ নিঃসৃত হওয়ায় সেই সেই ইন্দ্রিয়-স্থান আর্দ্র থাকে।

মুখ-গহ্বরের কোন্ কোন্ স্থানে স্বাদ-বোধ জন্মে, তাহা অদ্যাপি নির্ব্বিবাদে নিশ্চিত হয় নাই। যাহা-হউক, জিহ্বা দ্বারা প্রধানতঃ স্বাদ জ্ঞান জন্মে এবং তালু ও মুখাভ্যন্তরীণ অন্যান্য স্থান দ্বারা ঐ কার্য্যের অনেক সহায়তা হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

জিহ্বা পেশী-নির্ম্মিত ও শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বকে আবৃত।

উহাতে বহুল রক্ত-বহ নাড়ী, স্নায়ু ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উচ্ছ্রায় ব্যাপ্ত আছে, জিহ্বা স্বাদ জ্ঞান জননের প্রধান সাধন হইলেও উহার সমুদয় স্থলে সমানরূপে ঐ জ্ঞান জন্মে না। উহার কোন্ স্থানে ঐ জ্ঞান বিশেষরূপে জন্মে, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। অনেকের মতে, জিহ্বার যে ভাগ মুখ-গহ্বরের পশ্চাদ্দেশে আছে, সেই স্থানেই ঐ জ্ঞান প্রধানতঃ জন্মিয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিত জিহ্বার সীমাদেশের আস্বাদ জ্ঞান জনকতা শক্তি অস্বীকার করেন। তাঁহারা কহেন, ঐ স্থানের স্পর্শজ্ঞান জনকতা শক্তির আধিক্য প্রযুক্ত স্বাদজনক দ্রব্য বিশেষ সংস্পর্শে উহার সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাতেই লোকে তাহাতে স্বাদজনকতা শক্তি আরোপিত করিয়া থাকে। যাহাহউক, এই বিষয় অদ্যাপি নির্ব্বিবাদে স্থিরীকৃত হয় নাই।

অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যত ত্বরায় তত্তৎ ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান জন্মে, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা সেরূপ সত্বর স্বাদবোধ হয় না। ভোজ্য দ্রব্য কিছুকাল জিহ্বা দ্বারা আন্দোলন করিলে, পরিস্ফুট রূপে তাঁহার আস্বাদগ্রহ হয়। কোন দ্রব্য-বিশেষের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে, আমরা বিলক্ষণ রূপে তাহা মুখমধ্যে সঞ্চালন করিয়া থাকি, ফলতঃ স্বাদজনক পদার্থ দীর্ঘকাল ও

বারম্বার স্বাদেন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট না হইলে তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ বোধ হয় না।

ব্যক্তি বিশেষে স্বাদ জ্ঞানের বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। কোন কোন ব্যক্তি ভক্ষ্য দ্রব্যের অতি অল্প-মাত্র আস্বাদ পাইয়া থাকেন; তাঁহারা যাহা আহার করেন, তাহার স্বাদ বিস্বাদের বিষয় তত বিবেচনা করেন না। কেহ বা বিশেষ-চিন্তিতা সহকারে খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। এই-রূপ আস্বাদ গ্রহণের তারতম্য ঘ্রাণশক্তির ইতর-বিশেষের উপরিও অনেক নির্ভর করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রবল ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভোজনকালে খাদ্যের সৌগন্ধ বিশেষ-রূপে অনুভব করাতেও তাঁহা-দিগের নিকট তাহা অধিকতর প্রীতিকর বোধ হয়।

শারীরিক অবস্থা ভেদেও স্বাদবোধের ভিন্নতা হইয়া থাকে। যে দ্রব্য এক সময়ে সুরস ও সুস্বাদ বোধ হয়, তাহা অন্য সময়ে বিরস ও বিস্বাদ বোধ হইয়া থাকে। পীড়িতাবস্থায় অতি মধুর দ্রব্যও রসনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বোধ হয়। বোধ হয়, শারী-রিক নিয়ম লঙ্ঘনের যে পাপফলে পীড়া উপস্থিত হয়, সুমধুর স্বাদু বঞ্চনাও সেই ফলে হইয়া থাকে।

মনুষ্য অপেক্ষা ইতর প্রাণীদিগের স্বাদ বোধ অতি অল্প হইয়া থাকে। আমরা যেমন রসনেন্দ্রিয়ের

সাহায্যে খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা করিয়া লই, তাহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনুকূল্যে তাহাই করিয়া থাকে। এই জন্য অনেক ইতর জন্তু-দিগকে কোন বস্তু ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে তাহা আঘ্রাণ করিতে দেখা যায়। কোন কোন জন্তুর কিছুমাত্র স্বাদজ্ঞান জন্মে না, যাহারা চর্ব্বণ না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগের অনেকেই এই শ্রেণী ভুক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দর্শনেন্দ্রিয়।

চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় কহে। চক্ষু আমাদিগের মহোপকারী চিরসঙ্গী বন্ধু। আমরা যে এই অত্যাশ্চর্য্য শোভাপূর্ণ ধরিত্রীর বিচিত্র রমণীয়তা সন্দর্শনে সুখী হই, চক্ষুই তাহার নিদান। চক্ষু অভাবে সমুদায় বিশ্ব অন্ধকারময় বোধ হয়; তাহার অনির্ব্বচনীয় শোভনীয়তা আমাদিগের সম্বন্ধে কোন কার্য্যেরই হয় না। আমরা ধরাধামে যে ইচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে সক্ষম হই; গ্রন্থাধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিতগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভে সমর্থ হই; বিজ্ঞান-কাণ্ডের উদ্ভেদিত তত্ত্বের কার্য্য-প্রয়োগ করিয়া তাহার সুখময় ফলভোগ করি;

এবং আপনাদিগের প্রয়োজনানুরূপ সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নিষ্পন্ন করি, চক্ষুই তাহার সাধন। ফলতঃ এই ইন্দ্রিয়-লভ্য সুখ ও উপকারের অবধি বা বিরাম নাই। প্রতিপাদক্ষেপে ও প্রত্যেক কার্য্যে পরম সুহৃদের ন্যায় ইহা আমাদিগের সহায়তা করিয়া থাকে।

চক্ষুর গঠনপ্রণালী অতীব চমৎকারজনক। অসীম জ্ঞানসম্পন্ন দেহ-নির্ম্মাতার নেত্র নির্ম্মাণ কৌশলে বিজ্ঞানতত্ত্বের এক বিস্তৃত ভাগের উপদেশ লাভ করা যায়। চক্ষু রচনা বিষয়ে তিনি যেরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে যথোপযুক্ত স্থানে নিবেশিত করিয়াও সেইরূপ আপন অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি চক্ষুকে মুখমণ্ডলে স্থাপন করিয়া এক স্থানে সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা গুণের সন্নিবেশ করিয়াছেন। উহা যে স্থানে অবস্থিত আছে, তাহা হইতে অন্যত্র স্থাপিত হইলে বিস্তৃত-লোচন পরম রূপবান্ পুরুষেরও মুখমণ্ডলের রমণীয়তা বিলুপ্ত এবং এক্ষণকার ন্যায় সুচারু দর্শনক্রিয়ার সম্যক্ ব্যাঘাত হইত।

দৃষ্টিবিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলে, দর্শনেন্দ্রিয়ের সমুদায় তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। এই স্বল্পসীম গ্রন্থে সে শাস্ত্রের বাহুল্য বিবরণ করা

কথনই সম্ভব নহে। এই পুস্তকে কেবল চক্ষুবিষয়ক অনায়াসবোধ্য কতিপয় বিষয়ের বিবরণ করা যাইবে।

চক্ষুর গঠন প্রণালী—চক্ষু প্রায় গোলাকার বস্তু। উহার মধ্যে প্রকার বিশেষের স্বচ্ছ তরল পদার্থ আছে। ঐ তরল পদার্থ পর্দ্দাত্রিতয়ে আবৃত হইয়াছে। ঐ পর্দ্দাত্রয়ের বহিঃস্থ পর্দ্দা শ্বেতচ্ছদ নামে অভিহিত হইল। চক্ষুর উপরিভাগ দর্শন করিলে উহার যে অংশ শুভ্র প্রতীয়মান হয়, তাহা ঐ পর্দ্দার গাত্র, এইজন্য উহা ঐ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতচ্ছদ, ভেদাবরোধক ও অস্বচ্ছ। উহাদ্বারা চক্ষুর সমুদায় ভাগ আবৃত নহে; উহার $\frac{8}{৫}$ অংশ আচ্ছাদিত। উহার সম্মুখদিকে এবং পশ্চাদ্দেশে এক একটী ছিদ্র আছে। সম্মুখদিকের ছিদ্রটী পশ্চাৎস্থ ছিদ্র অপেক্ষা বড়। সম্মুখের ছিদ্র একটী স্বচ্ছ ন্যুব্জ পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ ন্যুব্জ পদার্থ স্বচ্ছ শৃঙ্গবৎ বলিয়া নৈত্রশৃঙ্গ শব্দে নামিত হইল। শ্বেতচ্ছদ অপেক্ষা নৈত্রশৃঙ্গের বহির্দ্দেশ অধিক ন্যুব্জ; সুতরাং উহার কতক ভাগ শ্বেতচ্ছদ হইতে সম্মুখদিকে উন্নত হইয়া আছে। শ্বেতচ্ছদের পশ্চাদ্দেশের ছিদ্র দিয়া দর্শনস্নায়ু নেত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শ্বেতচ্ছদের নিম্নের পর্দ্দাকে মধ্যাবরণ নামে নির্দ্দেশ করা গেল। শ্বেতচ্ছদের যে যে স্থানে রন্ধ্র আছে, তাহার ঠিক নিম্নে

মধ্যাবরণের সেই সেই স্থানে ছিদ্র আছে। মধ্যাবরণের সম্মুখদিকের ছিদ্রটী কাচধর্ম্মী দ্বিন্যুব্জ পদার্থ বিশেষ দ্বারা আবৃত আছে—ঐ পদার্থকে নৈত্রকাচ কহে। নৈত্রকাচ, নৈত্রশৃঙ্গের ঠিক নিম্নভাগে তাহার সহিত সমকেন্দ্রিক* রূপে অবস্থিত আছে। নৈত্রকাচ, স্বচ্ছ আবরণে বেষ্টিত প্রকার বিশেষের স্বচ্ছ পদার্থমাত্র। ঐ স্বচ্ছ পদার্থের বহির্দ্দেশ হইতে যে স্থান অন্তর্দ্দেশের, ও প্রান্তদেশ হইতে যে স্থান কেন্দ্রের যত নিকটবর্ত্তী সেই স্থানের ঘনত্ব ও রশ্মিভঙ্গকতা গুণ তত প্রবল।

মধ্যাবরণের নিম্নের পর্দ্দাটীতে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিমা জন্মে বলিয়া উহা ছায়াপট শব্দে সংজ্ঞিত হইল। ছায়াপট স্বচ্ছ ও কোমল। নৈত্রশৃঙ্গ যে স্থানে শ্বেতস্কন্দমুখে লগ্ন হইয়াছে, ইহাও সেই স্থানে নিঃশেষিত হইয়াছে। ছায়াপট, চক্ষুর অন্তর্দ্দেশের অধিকাংশ ব্যাপ্ত দর্শন-স্নায়ুর বিস্তৃতি-বিশেষমাত্র।

নৈত্রকাচ ও নৈত্রশৃঙ্গ এই উভয়ের অন্তরীণ স্থান একখানি অঙ্গুরীয়াকীর অস্থূল পর্দ্দাদ্বারা দুই অসমান অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ পর্দ্দার বর্ণ স্বচ্ছগুণ-

---

* যে যে বস্তু একরূপে অবস্থিত যে তাহাদিগের কেন্দ্র এক স্থলে বা সমসূত্ররূপে থাকে সেই সেই বস্তুকে সমকেন্দ্রিক কহে।

সম্পন্ন নৈত্রশৃঙ্গের মধ্যদিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এবং উহারই বর্ণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুর বর্ণ, কৃষ্ণ, নীল, বা পিঙ্গল দেখা যায়। এইহেতু উহাকে বর্ণিলচ্ছদ বলিয়া অভিহিত করা গেল। বর্ণিলচ্ছদ বেষ্টিত একটী গোলাকার রন্ধ্র আছে। ঐ রন্ধ্রকে নেত্রতারকা বা কনীনিকা কহে।

নৈত্রশৃঙ্গ ও নৈত্রকাচের অন্তর্গত ভাগ একপ্রকার জলীয় রসদ্বারা পূর্ণ আছে। নৈত্রকাচের পশ্চাৎস্থ নেত্রভাগও আর একপ্রকার রসদ্বারা পূর্ণ আছে—ঐ রসকে স্ফাটিক রস কহে।

চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকার উভয় পার্শ্বে দুইটী গহ্বরমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ঐ গহ্বরদ্বয়ের আকার ও গঠন চক্ষু ধারণ করিবার উপযুক্ত এবং উহা কোমল পদার্থ-বিশেষে আচ্ছাদিত আছে। ঐ কোমল পদার্থ চক্ষুর গদিস্বরূপ কার্য্য করে। ঐ গদির গাত্র তচ্চতুঃ-পার্শ্বস্থ-গ্রন্থি-নিঃসৃত রস-বিশেষ-দ্বারা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, তাহাতে চক্ষুর্দ্বয় অনায়াসে ভ্রামিত হইতে পারে।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কপালাস্থি, নাসাস্থি ও হন্বস্থি প্রভৃতি উন্নত থাকিয়া চক্ষুকে অনেক প্রকার আপদ্ হইতে রক্ষা করে। নেত্রোপরি কপালাস্থির উন্নতি স্থলে ভ্রূ বিন্যস্ত হইয়াছে। ভ্রূ থাকাতে কপাল-

দেশ হইতে ঘর্ম্ম এবং উপরি হইতে তীক্ষ্ণ আলোক আসিয়া নয়নমধ্যে পড়িতে পারে না। নেত্রচ্ছদ দ্বারা আবশ্যকানুসারে চক্ষুঃ নিমীলন ও উন্মীলন করিতে পারা যায়; তাহাতেও আমরা অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকি।

কতকগুলি পেশী দ্বারা চক্ষুকে নির্দ্দিষ্ট সীমা মধ্যে এদিকে ওদিকে সঞ্চালিত করিতে পারা যায়। যে সকল পেশী দ্বারা চক্ষুর ঐরূপ সঞ্চালন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, তাহাদিগের মূল দেশ নেত্র-গহ্বরের অস্থিতে ও শেষ ভাগ শ্বেতচ্ছদের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নিবদ্ধ আছে। ঐ ঐ পেশীতে তচ্চালক স্নায়ু সকল লগ্ন আছে। এক প্রকার রস নিস্রুত হইয়া চক্ষুর এইরূপ সঞ্চালন ক্রিয়ার আনুকূল্য করে। ঐ রসকে অস্রু এবং তৎ স্রাবী মাংসগ্রন্থিকে আস্রব গ্রন্থি কহে। নেত্রচ্ছদের নিমেষোন্মেষ দ্বারা ঐ রস নিস্রুত হইয়া শ্বেতচ্ছদের বহির্দ্দেশ অনবরতই সিক্ত করিতেছে। চক্ষুকে নাসাভিমুখে, কর্ণাভিমুখে, ঊর্দ্ধদিকে ও অধোদিকে ফিরাইতে পারাযায়। কিন্তু উহার পার্শ্বগতি অপেক্ষা ঊর্দ্ধাধঃ গতি ন্যূন।

দর্শন ক্রিয়া।—কোন বস্তু হইতে আলোক কিরণ আসিয়া নয়নমধ্যে পতিত হইলে আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাইয়া থাকি। তদ্ভিন্ন কোন বস্তুর দর্শন-

জ্ঞান জন্মে না। অন্ধতমসাচ্ছন্ন বস্তু হইতে আলোক আসিয়া আমাদিগের নেত্রমধ্যে পড়ে না, এই জন্য আমরা তাদৃশ বস্তু দেখিতে পাই না। আমরা যে সকল বস্তু দর্শন করি, তাহার প্রত্যেক বিন্দুমিত্ত স্থান হইতে কতগুলি কিরণ আসিয়া নেত্রোপরি নিপতিত হয়। এক বিন্দু হইতে যে কিরণ-সমষ্টি আইসে তাহাকে কিরণসংঘ কহে। কিরণসংঘ এক বিন্দু স্থান হইতে একটির ন্যায় উদ্গত হইয়াই পরস্পর পৃথক হইয়া পরস্পর বিমুখ হইতে থাকে। ঐ রূপ কিরণের পৃথক হওয়াকে কিরণ-বিসারণ কহে। বিসারিত কিরণসংঘ নয়নোপরি পতিত হইলে, যে যে কিরণ শ্বেতচ্ছদের উপরি পড়ে, তাহারা ইতস্ততঃ প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুর ঐ ভাগকে দৃশ্যমান করে; যে সকল কিরণ নৈত্র-শৃঙ্গোপরি পতিত হয়, তাহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কিরণ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে। অস্বচ্ছ পদার্থোপরি কিরণ নিপতিত হইলে তাহার কতকভাগ প্রতিফলিত হয় ও কতকভাগ ঐ পদার্থকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া যায়; স্বচ্ছ পদার্থোপরি পড়িলে তন্মধ্য দিয়া গমন করে। শ্বেতচ্ছদ অস্বচ্ছ, এইজন্য তদুপরি নিপতিত কিরণসমূহ তদ্দ্বারা প্রতিফলিত হয়, এবং নৈত্রশৃঙ্গ স্বচ্ছ বলিয়া তদুপরি নিপতিত কিরণগুলি

তন্মধ্যদিয়া প্রবেশ করে। আবার, আলোক কিরণ ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব গুণবিশিষ্ট স্বচ্ছপদার্থ মধ্যদিয়া গমন কালে যদি সেই সকল পদার্থোপরি বক্রভাবে পতিত হয়, তবে তাহার গতি সরল না হইয়া বক্র হইয়া যায়। স্বচ্ছ পদার্থের যে গুণ থাকায় এইরূপ ঘটনা হয়, তাহাকে কিরণভঞ্জকতা গুণ কহে। ঐ কিরণ-ভঞ্জকতা গুণ সকল দ্রব্যের সমানরূপ থাকে না। কোন স্বচ্ছপদার্থে কতকগুলি কিরণ পড়িলে তাহারা বক্র ও পরস্পর বিমুখী হইয়া গমন করে; কোন দ্রব্য পড়িয়া পরস্পরাভিমুখ হইয়া যায়। স্বচ্ছ পদার্থের সহিত কিরণের এই ধর্ম্ম দেখিয়া ঈক্ষণ-নির্ম্মাতারা নানাপ্রকার ঈক্ষণ-নির্ম্মাণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কাচ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যে কাচে কিরণ সকল পড়িলে তন্মধ্য দিয়া গমনকালে বক্র হইয়া পরস্পর অভিমুখী হইয়া গমন করে, তাহার আকার ন্যুব্জ, এবং তাহাকে সমাহারী ঈক্ষণ কহে; যে কাচ মধ্য-দিয়া গমনকালে পরস্পর বিমুখ হয়, তাহার আকার কুব্জ ও তাহাকে বিসারী ঈক্ষণ কহে। নৈত্রশৃঙ্গ বায়ু অপেক্ষা ঘন, ও সমাহারী ঈক্ষণের ন্যায় ন্যুব্জ; অতএব কিরণসংঘ বিসারিত হইয়া তন্মধ্য দিয়া গমন কালে বক্র হইয়া পরস্পর অভিমুখী হইতে থাকে।

নৈত্রশৃঙ্গ ভেদ করিয়া যে সকল কিরণ নেত্রমধ্যে

উত্তীর্ণ হয়, তাহার যে যে কিরণ কনীনিকায় পড়ে, তাহারা তন্মধ্য দিয়া নৈত্রকাচের উপরি পৌঁছে। যাহারা নেত্ররঞ্জনের উপরি পতিত হয়, তাহারা তৎকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া যায়। নৈত্রকাচে পতিত কিরণগুলিও উহার দ্বিন্যুব্জতা ধর্ম্ম হেতু পরস্পর অভিমুখী হয়। নেত্রান্তরীয় জলীয় রস ও স্ফাটিক রস মধ্যদিয়া গমনকালেও ঐরূপে বিসারিত কিরণগুলি পরস্পরাভিমুখী হইতে থাকে। এইরূপে কিরণগুলি সমাহৃত অর্থাৎ এক স্থানে মিলিত হইয়া দৃশ্যমান বস্তুর যে বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, ছায়াপটে উপস্থিত হইয়া সেই বিন্দুর প্রতিকৃতি উৎপাদিত করে। এইরূপে উৎপাদিত বিন্দুপরম্পরা দ্বারা দৃশ্যমান বস্তুর সমুদায় অবয়ব ছায়াপটে প্রতিমিত হয়। ছায়াপট দর্শনস্নায়ুর বিস্তৃতি, অতএব দর্শনস্নায়ু ঐ প্রতিমাস্পর্শে চেতিত হইয়া তাহার জ্ঞান মনোমধ্যে সঞ্চরণ করে। এইরূপে আমাদিগের দর্শনজ্ঞান জন্মে।

কোন বস্তুর পরিস্কাররূপে দর্শন সাধন জন্য প্রথমতঃ ছায়াপটে উহার পরিষ্কৃত প্রতিমা উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ উহার উপযুক্ত আয়তন থাকা চাহি। তৃতীয়তঃ উহা বিশেষরূপে আলোকবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়। চতুর্থতঃ ছায়াপটে

উহার উপযুক্ত কাল স্থিতি হওয়া আবশ্যক। ইহার কোন বিষয়ের ব্যত্যয় হইলেই দর্শনজ্ঞানের ব্যাঘাত হয়।

সকল ব্যক্তির সমানরূপে দর্শনজ্ঞান জন্মে না। কেহ কেহ নিকটস্থ বস্তু দেখিতে পায় না, কিন্তু দূরস্থ পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে পারে। কেহবা চক্ষুর নিকটস্থ না হইলে কোন বস্তুকেই দেখিতে পায় না। এই প্রকার চক্ষুরোগগ্রস্তদিগকে দূরদৃষ্টি ও খর্ব্বদৃষ্টি কহে।

খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তির নেত্রের কিরণ সমাহরণ গুণ প্রবল। নিকটস্থ পদার্থ হইতে যে কিরণসংঘ নয়নোপরি পতিত হয়, তাহার কিরণসমূহ যেমন পরস্পর বিমুখী হইয়া নেত্রোপরি পড়ে, দূরস্থ পদার্থগত কিরণসমূহ তত বিমুখী হইয়া পড়ে না; তাহারা প্রায় সমান্তরাল রূপে চক্ষুর উপরি পড়িয়া থাকে। সুতরাং নিকটস্থ পদার্থাগত পরস্পর বিমুখী কিরণসমূহ যত বিলম্বে সমাহৃত হইত, নেত্রের কিরণ সমাহরণ শক্তির প্রাবল্য প্রযুক্ত দূরস্থ পদার্থাগত সমান্তরাল কিরণ গুলি তাহা অপেক্ষা শীঘ্র অর্থাৎ ছায়াপটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই একস্থানে সমাহৃত হইয়া যায়। তথা হইতে আবার বিসারিত হইয়া ছায়াপটে অতি অপরিষ্কার প্রতিমূর্ত্তি উৎপাদন করে। সুতরাং দূরস্থ বস্তুর

পরিষ্কার রূপে দর্শন জ্ঞান জন্মে না। খর্ব্বদৃষ্টি লোকেরা এইরূপ নেত্ররোগের প্রতীকারার্থ বিসারী ঈক্ষণ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাতে কিরণ গুলি নেত্রোপরি পতিত হইবার পূর্ব্বে সমধিক বিসারিত হইয়া যায়। তাহাতেই নেত্রের কিরণ সমাহরণ গুণের প্রাবল্য প্রযুক্ত যে সকল কিরণ ছায়াপটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সমাহৃত হইয়া যাইত, তাহারা তত শীঘ্র সমাহৃত হইতে না পারিয়া ছায়াপটে পৌঁছিয়া অংশুমেল * উৎপন্ন করে।

যেমন চক্ষুর কিরণ সমাহরণ গুণের প্রাবল্য প্রযুক্ত খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিরা দূরস্থ বস্তু দেখিতে পায় না, সেইরূপ ঐ গুণের দৌর্ব্বল্য বশতঃ দূরদৃষ্টি ব্যক্তির নিকটস্থ বস্তু আলোক্য হয় না। কিরণসংঘ তাহাদিগের নয়নের ছায়াপটে সমাহৃত না হইয়া তাহার পশ্চাদ্দেশে সমাহৃত হয়। সুতরাং ছায়াপটে পরিষ্কৃত প্রতিকৃতি জন্মে না। এইরূপ ব্যক্তিরা সমাহারী ঈক্ষণ ব্যবহার করিয়া চক্ষুর দোষের প্রতীকার করে। ঐরূপ ঈক্ষণের সমাহরণ শক্তি চক্ষুর সমাহরণ-ক্রিয়ায় আনুকূল্য করিয়া কিরণসমূহ ছায়াপটে সমাহৃত করে। বৃদ্ধ বয়সে চক্ষুর সমাহরণ শক্তি ম্লান হইয়া

---

* পরস্পরাভিমুখী কিরণগুলি যে স্থানে মিলিত হয়, তাহাকে অংশুমেল কহে।

যায়। এই নিমিত্ত, তৎকালে সমাকারী ঈক্ষণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন কখন বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ঈক্ষণ ব্যতীত কোন বস্তু দর্শন করিবার অভিলাষ করিলে তাহা চক্ষু হইতে দূরে ধরিয়া দেখে। তাহাতে ঐ বস্তুর কিরণসমূহ সমান্তরাল হইয়া পড়ে। সুতরাং সহজে ছায়াপটে সমাহৃত হইতে পারে।

পরীক্ষা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, দুই ফিটের যত নিকটস্থ পদার্থ হইতে কিরণ আসিয়া নয়নোপরি পতিত হয়, তাহারা পরস্পর তত বিমুখী হইয়া পড়ে। অতএব উপরি লিখিত বিবরণানুসারে প্রতিপন্ন হইতে পারে, যে ব্যক্তি দুই ফিট দূরস্থ পদার্থ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পায়, তাহার তদপেক্ষা নিকটস্থ বস্তু তত পরিষ্কার রূপে দৃষ্টি করা সঙ্গত নহে, এবং যে ব্যক্তি দুই ফিটের নিকটস্থ পদার্থ স্পষ্টরূপে দর্শন করিতে পারে, তাহার তদপেক্ষা দূরস্থ পদার্থ সেরূপ পরিষ্কার রূপে আলোক্য হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু করুণাবান্ জগদীশ্বর এমনি কৌশল করিয়া নেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে যাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত নেত্ররোগাক্রান্ত তাহারা ভিন্ন সকলেই কি দুই ফিটের দূরবর্ত্তী কি তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী উভয় প্রকার পদার্থই সমানরূপে দেখিতে পায়। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, সুস্থ ব্যক্তির চক্ষুর প্রয়োজ-

নানুসারে কিরণ সমাহরণ ও বিসারণ শক্তি বৃদ্ধি হইয়া দুই ফিটের নিকটস্থ বা দূরস্থ সকল পদার্থই তুল্যরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চক্ষু দ্বারা কেবল আলোক ও বর্ণের জ্ঞান জন্মিলেও তদানুষঙ্গিক আমাদিগের এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে, আমরা চক্ষু দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু সকলের আকার, আয়তন, গতি, দূরত্ব, অনায়াসে স্থির করিতে পারি। কিন্তু বস্তু-সমূহের যে আকার আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাহাদিগের প্রকৃত আকার নহে। তাহা-দিগের প্রকৃত আকৃতি তাহা অপেক্ষা বৃহৎ। আমরা কোন বস্তুকে দেখিতে পাই না, চক্ষুর মধ্যে তাহার যে প্রতিকৃতি পড়ে, তাহাই দর্শন করিয়া থাকি। এই নিমিত্ত, বস্তুর দূরত্ব অনুসারে তাহাদিগের আকার ন্যূনাধিক প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত বস্তু নিকটেই থাক বা দূরবর্ত্তী হউক, তাহার আকারের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং সেই বস্তু দেখিতে পাইলে দূরত্ব অনুসারে তাহার ছোট বড় বোধ হইবে কেন? কিন্তু দূরত্ব অনুসারে চক্ষুর মধ্যে নিপতিত দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিকৃতির ন্যূনাধিক্য হয়, সুতরাং তদনুসারে তাহা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঐ দূরত্ব যত অধিক হয়, দৃশ্যমান বস্তুর অবয়ব তত ছোট, এবং যত অল্প হয়, উহার অবয়ব তত বড়

দেখাইয়া থাকে। এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী ছোট বড় দুইটী বস্তু এককার এবং সমান আকারের দুই বস্তু ছোট বড় দেখা যায়। সূর্য্য, চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড়, তথাচ আমাদিগের দৃষ্টিতে ঐ উভয় প্রায় এককার বোধ হইয়া থাকে।

বস্তুর যে প্রতিমা আমাদিগের নয়নমধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা অতীব ক্ষুদ্র হইলেও সুচারু দর্শনের ব্যাঘাত হয় না। পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাহার উপরি ভাগে অনেক ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখিতে পাই। ঐ চিহ্ন-সকল যে যে স্থানে আলোক অবচ্ছেদ করে, সেই সেই স্থানের অবচ্ছেদক রেখাগুলিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছায়াপটে চন্দ্রের যে প্রতিমা উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যাস $\frac{১}{২৩০}$ ইঞ্চ হইবে, এবং উহার সমুদয় উপরি ভাগের পরিমাণ ফল এক বর্গ ইঞ্চের $\frac{১}{৫২৯০০}$ ভাগের ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন হইবে, তথাচ তন্মধ্যে আমরা কত কত সূক্ষ্ম বিষয় দেখিতে পাইয়া থাকি। চন্দ্র-মণ্ডলের উপরি ভাগে যে সকল চিহ্ন দেখিতে পাই, তাহাদিগের রৈখিক আয়তন চন্দ্রের দৃশ্যমান ব্যাস-পরিমাণের এক দশাংশ নহে। সুতরাং ছায়াপটে তাহাদিগের যে প্রতিকৃতি হয়, তাহা এক বর্গ ইঞ্চের $\frac{১}{৫০১০০০০}$ ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন।

৭০ ইঞ্চ উচ্চ কোন মনুষ্যকে ৪০ ফিট দূর হইতে

অবলোকন করিলে ছায়াপটে তাহার $\frac{১}{১৪}$ ইঞ্চ উচ্চ প্রতিমা জন্মে। ঐ প্রতিমার মুখমণ্ডলের ব্যাস তাহার উচ্চতার দ্বাদশ ভাগের একভাগ হইবে, তাহা হইলেই উহার ব্যাস পরিমাণ প্রায় $\frac{১}{১৭০}$ ইঞ্চ হইল। কিন্তু এই অল্পস্থান মধ্যেও চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও তাহার সমুদায় বিশেষ বিশেষ ভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। চক্ষুর ব্যাস, মুখমণ্ডলের ব্যাস-পরিমাণের দ্বাদশ ভাগের একভাগ। সুতরাং ছায়াপটে উহা এক বর্গ ইঞ্চের $\frac{১}{৪০০০০০০}$ স্থানমাত্র অধিকার করিয়া থাকে। তথাচ উহার দর্শন জ্ঞান অনায়াসে জন্মিয়া থাকে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে চক্ষুর দ্বিতীয় পর্দ্দায় দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিমা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৃতীয় পর্দ্দা, যাহাকে এক্ষণে ছায়াপট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহাতে ঐ প্রতিমার স্পর্শ হইলে আমাদিগের দর্শন জ্ঞান জন্মে। তাহা হইলেও তৃতীয় পর্দ্দার স্পর্শজ্ঞান জনন শক্তি যে কত প্রবল তাহা চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারা যায় না। হা! জগদীশ্বর! তোমার অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য সমুদায় আমরা মনোমধ্যে ধারণা করিতেও সমর্থ নহি!

যেমত নেত্রমধ্যে বস্তুর পরিস্ফুত প্রতিমোৎপত্তি তাহার সুচারু দর্শনের নিমিত্ত আবশ্যক, তেমনই তাহার উপযুক্ত মত আলোক-সম্পন্নতাও বিশেষ

প্রয়োজনীয়। নিতান্ত আলোক বিহীন কোন পদার্থের সুচারু প্রতিমূর্ত্তি ছায়াপটে জন্মে না। সেই রূপ, অত্যন্ত আলোকময় বস্তু দর্শন করিলে তজ্জনিত চক্ষুতে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়, এবং তাহার সুন্দর দর্শনেরও ব্যাঘাত হয়। কিন্তু জগদীশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে, সময়ানুসারে নেত্র-তারকা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া তন্মধ্যে আবশ্যক পরিমিত আলোক প্রবেশ সম্পাদন করে। অল্প আলোকে তারকা প্রসারিত হইয়া অধিক সঙ্খ্যক আলোককিরণ গ্রহণ করে, তাহাতেই বিরলান্ধকার স্থানে কিছু কিছু দেখা গিয়া থাকে। চক্ষুর মধ্যে অত্যন্ত আলোক প্রবিষ্ট হইয়া দর্শনস্নায়ু বিঘ্নিত না করে, এই জন্য অত্যন্ত আলোকে তারকা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অন্ধকারময় গৃহে কিয়ৎকাল থাকিয়া সহসা কোন আলোক বিশিষ্ট স্থানে গমন করিলে তারকা সঙ্কুচিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাতে অধিক সংখ্যক কিরণ প্রবেশ করে, তাহাতেই তৎকালে চক্ষুতে বেদনা বোধ হয় এবং নেত্রচ্ছদ নিমীলিত করিতে হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই চক্ষুর তদবস্থোচিত ভাব জন্মিলে অনায়াসে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারা যায়। সেইরূপ, কোন ব্যক্তি কোন আলোকময় গৃহ হইতে হঠাৎ বাহিরে আসিলে প্রথমে কিছুই

দেখিতে পায় না। আলোকময় গৃহে অবস্থান কালে তাহার কনীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; সহসা অন্ধকারাবৃত স্থানে আসিলে যতক্ষণ উহা প্রসারিত হইয়া অধিক সংখ্যক আলোক গ্রহণ না করে, ততক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অনন্তর কিছুকাল পরেই যখন তারকা প্রসারিত হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্বাদৃষ্ট অনেক বস্তু দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয়-দ্বারা কেবল আলোক ও বর্ণের জ্ঞান জন্মে। দ্রব্যের গঠন, আকার, পরস্পর দূরত্ব ও গতিজ্ঞান স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়ের চেষ্টাধীন জন্মে। কিন্তু বর্ণানুভাবকতা শক্তিও সহসা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা জন্মে না; উহাও অভ্যাস-ধর্ম্ম-মূলক। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, নবজাত শিশুরা চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুর বর্ণভেদ করিতে পারে না। জন্মান্ধ ব্যক্তিরা মুক্তদৃষ্টি হইলে শীঘ্র তাহাদিগের বর্ণজ্ঞান জন্মে না। তৎকালে কি নিকটস্থ, কি দূরবর্ত্তী, সকল বস্তুই তাহাদিগের চক্ষুর সমীপবর্ত্তী বোধ হয়, এবং তাহাদিগের আকার বা বর্ণজ্ঞান জন্মে না।

বর্ণান্ধতা—আমরা জগদীয় সমুদায় পদার্থ কোন না কোন বর্ণবিশিষ্ট দেখিয়া থাকি; সূর্য্যকিরণই তাহার কারণ। সূর্য্যকিরণ দৃশ্যতঃ শ্বেতবর্ণ হইলেও

উহাতে নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি বর্ণিল কিরণ নিগূঢ়রূপে বর্ত্তমান থাকে। কোন ত্রিকোণাকার কাচ বিশেষে সূর্য্যকিরণ পাতিত করিলে ঐ সকল বর্ণ অনায়াসে লক্ষিত হয়। অস্বচ্ছ বস্তুমাত্রেই সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে তাহার কতকভাগ প্রতিফলিত হয়, ও কতক তৎকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া যায়। যে বস্তুদ্বারা যে বর্ণের কিরণ প্রতিফলিত হয়, তাহা তদ্বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শষ্পাদিতে সূর্য্যকিরণ পঁড়িলে হরিদ্বর্ণ কিরণ ভিন্ন আর সমুদায় কিরণ তৎকর্ত্তৃক শোষিত হয়; কেবল হরিদ্বর্ণ কিরণ প্রতিফলিত হইয়া নেত্রমধ্যে পতিত হয়, এইজন্য তাহাদিগকে হরিদ্বর্ণ দেখায়। কিন্তু নেত্রান্তঃ রস অস্বচ্ছ ও বর্ণযুক্ত হইলে দৃশ্যমান বস্তু সমূহের ঐ বর্ণিল কিরণের কোন কোন বর্ণভাগ তৎকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া যায়, তাদৃশ স্থলে ছায়াপটে কোন বস্তুর অঙ্গাদিবোধক প্রতিমা জন্মিলেও তাহার যে যে বর্ণ নেত্রান্তঃ রসে আবদ্ধ হয়, তাহাকে সেই সেই বর্ণবিহীন দেখায়। যদি নেত্রান্তঃ রসে লোহিত বর্ণ আবদ্ধ হয়, তবে দৃশ্যমান বস্তু ধূমলবর্ণ হইলে কৃষ্ণবর্ণমাত্র বোধ হয়। কিন্তু এরূপ নেত্ররোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

কর্ণ শব্দজ্ঞান জননের সাধন। শ্রবণক্রিয়া নিষ্পন্ন জন্য জগদীশ্বর কর্ণে যত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা সম্যক্ অবধারণ হয় নাই; তথাচ যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতেই অনন্ত কৌশল-কারীর অনন্ত শক্তির নিদর্শন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। কর্ণ একটি অপূর্ব্ব যন্ত্র। কর্ণ কুহর মধ্যে যে কোন প্রকার শব্দ প্রবিষ্ট হয়, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা অনুভব করিতে পারি। চক্ষুর ন্যায় উহাকে আমরা কোন দিকে সঞ্চালন করিতে পারিনা; কিন্তু যে দিকে যেপ্রকার শব্দের উৎপত্তি হউক, আমরা তাহা শ্রবণ করিতে পারি। কখন কখন কর্ণ দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্যও হইয়া থাকে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা আমরা পশ্চাৎ-স্থিত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ও শব্দদ্বারা অনুভূত করিতে পারি। শব্দের সহিত কর্ণের অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। নানাপ্রকার সুস্বর শ্রবণ করিয়া আমরা কত সুখই অনুভব করি। কর্ণ না থাকিলে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি বা বিহঙ্গরব আমাদিগের সম্বন্ধে

কোন কার্য্যেরই হইত না। ফলতঃ কর্ণ আমাদিগের অশেষ সুখের নিদান।

কর্ণের গঠনপ্রণালী—কর্ণ তিন ভাগে বিভক্ত—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ, ও অন্তঃকর্ণ। ঐ তিন ভাগের আকার পৃথক্ পৃথক্।

বহিঃকর্ণের কতক ভাগ শরীরের উপরিভাগে দেখা যায়—উহাকে কর্ণদল কহে। কর্ণকুহরে প্রবেশ পথ-মুখে তচ্চতুর্দ্দিকে বহিঃকর্ণের যে নিম্ন স্থল দেখা যায় তাহা দেখিতে শুক্তিকোষবৎ, এইজন্য শুক্তিদেশ্য নামে নির্দ্দিষ্ট। শুক্তিদেশ্যের ন্যায় কর্ণদলের আর কোন ভাগে শ্রবণক্রিয়ার সহায়তা হয় না। শুক্তিদেশ্য হইতে আরব্ধ হইয়া অভ্যন্তর ভাগে বহিঃকর্ণের যে অংশ গিয়াছে, তাহা নলাকার, উহাকে কর্ণের বহিষ্পথ কহে। বহিষ্পথের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে, এবং কর্ণের বহির্দ্দেশে উহার ব্যাসের যে পরিমাণ অভ্যন্তর ভাগে তাহা অপেক্ষা ন্যূন। বহিষ্পথ কর্ণাভ্যন্তরে ঠিক সরলভাবে না গিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গিয়াছে। সুতরাং শুক্তিদেশ্য, ও মধ্যকর্ণের সহিত বহিষ্পথের সংযোগস্থল, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের দৈর্ঘ্য বহিষ্পথের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বহিষ্পথের বহিরংশ উপাস্থিময় এবং অভ্যন্তরীণ ভাগ অস্থিময়। কর্ণদলের ত্বক্ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ঐ অস্থি-

ময় ভাগকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। মধ্যকর্ণ-প্রবেশ-রন্ধ্র-মুখে বহিষ্পথ কিঞ্চিৎ বক্রভাবে সংলগ্ন হইয়াছে।

মধ্যকর্ণ-প্রবেশ-রন্ধ্র কিঞ্চিৎ অণ্ডাকার। ঐ রন্ধ্রের উপরি একখানি স্থিতিস্থাপক ত্বক্‌বিশেষ সুলগ্নরূপে বিস্তৃত আছে, উহা দেখিতে পটহাচ্ছাদন চর্ম্মবৎ বলিয়া পটহচ্ছদ নামে অভিহিত হইল।

মধ্যকর্ণ অস্থিময় ভিত্তি পরিবেষ্টিত একটী গহ্বর-বিশেষ। ঐ গহ্বর সর্ব্বদা বায়ু পূর্ণ থাকে। গলগুহা হইতে একটী নলাকার প্রণালী-পথে বায়ু আসিয়া ঐ গহ্বর পূর্ণ রাখিয়া থাকে। বায়ু নাসাদ্বার দিয়া ফুস্ফুসে গমনকালে গলগুহা হইয়া যায়। সুতরাং গলগুহার সহিত ঐ নলের সংযোগ থাকায় মধ্যকর্ণা-ন্তরস্থ বায়ুর সহিত বাহ্যবায়ুর সংযোগ ও বাহ্যবায়ুর ভারানুসারে উহার ভার বিদ্যমান থাকে। বাহ্যবায়ুর সহিত কর্ণান্তরস্থ বায়ুর ঐরূপ সংযোগ থাকায় আমা-দিগের মহোপকার হইয়াছে। ঐরূপ সংযোগ না থাকিলে বাহ্যবায়ু অপেক্ষা মধ্যকর্ণান্তরীণ বায়ুর ভার বৃদ্ধি হইলে উহার বলে অথবা হ্রস্ব হইলে বাহ্যবায়ু-বলে পটহচ্ছদ বিদীর্ণ হইয়া আমাদিগের শ্রবণক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত করিত। বাহ্যবায়ুর সহিত উহার সংযোগ থাকায় সেরূপ ঘটিতে পারে না। বাহ্য-বায়ুর বলের সহিত উহার বলের সামঞ্জস্য থাকে।

মধ্যকর্ণের অভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে দুইটী প্রধান রন্ধ্র আছে—একটী বড়, আর একটী ছোট। বড় ছিদ্রের আকার অণ্ডের মত বলিয়া তাহার নাম অণ্ডবিল ও ক্ষুদ্র ছিদ্রটীর আকার গোলপ্রযুক্ত তাহাকে গোলবিল কহা যায়। ঐ রন্ধ্রদ্বয় পটহচ্ছদবৎ দুইখানি ত্বক্‌দ্বারা আবৃত। পটহচ্ছদ এবং অণ্ডবিলচ্ছদের মধ্যস্থলে একটী শৃঙ্খল আছে। ঐ শৃঙ্খল ৩খানি অস্থিখণ্ড সংযোগে উৎপন্ন। শিশু-শরীরে উহাতে ৪খানি অস্থি থাকে। ঐ শৃঙ্খল কয়েকখানি পেশীদ্বারা চালিত হয়। ঐ সকল পেশীর মূলদেশ মধ্যকর্ণের অস্থিময় বেষ্টনে নিবদ্ধ আছে।

অন্তঃকর্ণের নির্ম্মাণ অতীব চমৎকার-জনক, কিন্তু অত্যন্ত জটিল বলিয়া সাতিশয় দুর্ব্বোধ। শরীরের সমুদায় অস্থি অপেক্ষা কঠিন অস্থিতে ক্ষোদিত প্রণালী ও গহ্বর-নিচয় ঐ কর্ণের সামগ্রী। অন্তঃকর্ণের ঐ অস্থিখণ্ডের কাঠিন্য প্রস্তরের ন্যায় বলিয়া উহা শিলাস্থি নামে খ্যাত। অন্তঃকর্ণ তিন অংশে বিভক্ত —অলিন্দ, অর্দ্ধচক্রপ্রণালী ও শঙ্খনখ।

শিলাস্থির মধ্যভাগে ক্ষোদিত কক্ষ্যাবিশেষ অলিন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট। অলিন্দের বহির্বেষ্টনে অণ্ডবিলের অবস্থান এবং উহার অন্তর্বেষ্টনের একটী ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্কাগত শ্রবণ-স্নায়ু প্রবিষ্ট হইয়াছে। অলিন্দের

পশ্চাৎস্থ ঊর্দ্ধদেশে ৩টী অর্দ্ধ চক্র প্রণালী আছে। ঐ প্রণালী ত্রয়ের আকার অর্দ্ধচক্রের ন্যায়, এইজন্য উহারা ঐ নামে অভিহিত হইয়াছে।

একটী নল যদি ক্রমশঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এরূপে উঠে যে, তাহার ঊর্দ্ধদেশ অধোভাগ অপেক্ষা অবিস্তৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে যেমন দেখায়, শিলাস্থিতে তদাকারে ক্ষোদিত প্রণালীকে শঙ্খনখ কহে। শঙ্খনখ কোষ গত নালীর ঐরূপ আকার দেখিয়া পণ্ডিতেরা উহাকে ঐ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অলিন্দের অভ্যন্তরীণ সম্মুখ-ভাগে এবং গোল বিলের নিকটে শঙ্খনখ অবস্থিত। শঙ্খনখ এবং অর্দ্ধ চক্র প্রণালীত্রয়ের সহিত অলিন্দের বিশেষ রূপ সংযোগ আছে।

শ্রবণ-স্নায়ু যে পথ দিয়া অন্তঃকর্ণের অস্থিময় বেষ্টনে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে অভ্যন্তরীণ শ্রুতিপথ কহে। শ্রবণ-স্নায়ু অন্তঃকর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দুইটী প্রধান শাখায় বিভিন্ন হইয়াছে। ঐ শাখাদ্বয়ের একটী অলিন্দাভিমুখে ও অপরটী শঙ্খনখ-দিকে গমন করিয়াছে, এই প্রযুক্ত একটীকে অলিন্দ অন্যটীকে শঙ্খনখ-স্নায়ু কহে।

অর্দ্ধচক্র প্রণালী-ত্রয় মধ্যে ৩ টী তদাকারের নমনীয় নল আছে। ঐ নল-ত্রয়-মধ্যে শ্রবণ-স্নায়ুর শাখা

সকল প্রবিষ্ট ও তন্মধ্যগত এক প্রকার তরল পদার্থে নিমজ্জিত আছে। নলান্তর্গত ঐ তরল পদার্থকে অন্তর্লসীকা কহে। ঐ সকল নলের চতুষ্পার্শও আর একপ্রকার তরল পদার্থে পরিপূর্ণ আছে, তাহাকে পরিলসীকা। অলিন্দ ও শঙ্খনথও পরিলসীকায় পরিপূর্ণ। ফলতঃ অন্তঃকর্ণের সমুদায় রন্ধ্রাদি তরল পদার্থে পরিপূর্ণ আছে।

শ্রবণক্রিয়া—শব্দ-জনক বস্তু দ্বারা বায়ু প্রকারবিশেষে স্পন্দিত হইলে শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্পন্দিত-বায়ু কর্ণ-কুহর মধ্যে কিপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দোৎপাদন করে, তাহা কেহই অদ্যাপি পরিষ্কার রূপে স্থির করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ-জনক বস্তু দ্বারা বায়ু প্রকারবিশেষে কম্পিত হইয়া শ্রবণস্নায়ু প্রকার-ভেদে চেতিত করে, তাহাতেই নানাপ্রকার শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন জলের উপরি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহার চতুর্দ্দিকে একটী ক্ষুদ্র চক্রাকার তরঙ্গ উপস্থিত হয়, এবং সেই তরঙ্গ যত বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই তাহার নিকটস্থ জল ক্রমে ক্রমে তরঙ্গায়িত হয়, সেই প্রকার শব্দজনক বস্তুর সঞ্চালনে বায়ুতেও তরঙ্গ উপস্থিত হয়। কিন্তু বায়ু স্থিতিস্থাপক প্রযুক্ত জলের ন্যায় তরঙ্গায়িত

না হইয়া প্রকার বিশেষে স্পন্দিত হইয়া থাকে। শব্দকর বস্তু হইতে ঐরূপ স্পন্দিত বায়ু যত দূরবর্ত্তী হয়, ততই তাহার বেগ ম্লান হইয়া যায়। নিকটবর্ত্তী স্থানাগত শব্দায়মান-বায়ু কর্ণ-কুহরে বেগে আঘাত করিয়া যেরূপ শব্দ-জ্ঞান জন্মায়, দূরদেশ হইতে আগত তরঙ্গ দ্বারা সেরূপ পরিষ্কার রূপে শব্দ বোধ হয় না। আলোক কিরণের ন্যায় শব্দায়মান বায়ু-হিল্লোল উপায় বিশেষ দ্বারা সমাহৃত ও ঘনীভূত হইতে পারে। যে নল ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে, ও যাহার মুখ সম্যক্ বিস্তৃত, সেই নল দ্বারা স্পন্দিত-বায়ু সমাহৃত ও ঘনীভূত হয়। ঐরূপ নলের মুখ বিস্তৃত প্রযুক্ত অনেকগুলি শব্দায়মান তরঙ্গ তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে যত তাহার মধ্য দিয়া গমন করে, ততই একত্রিত ও সান্দ্র হইতে থাকে। এই জন্যই বেণু আদি বাদ্যযন্ত্রের বিস্তৃত মুখ হইতে যেরূপ তেজে শব্দ নির্গত হয়, সূক্ষ্ম মুখ দিয়া তাহা-অপেক্ষা অনেক তেজে বহির্গত হইতে দেখা যায়। বিস্তৃত মুখরন্ধ্রের পরিমাণ, সূক্ষ্ম মুখরন্ধ্রের পরিমাণ অপেক্ষা যে অনুপাতে অধিক হইবে, সূক্ষ্মমুখ নিঃসৃত শব্দ বিস্তৃত-মুখ-নির্গত শব্দ অপেক্ষা সেই অনুপাতে উচ্চ হইবে। কোন বেণুর বিস্তৃত মুখরন্ধ্রের ব্যাস পরিমাণ যদি এক ইঞ্চ্ ও সূক্ষ্ম মুখ-

রন্ধ্রের ব্যাস পরিমাণ যদি $\frac{১}{১০}$ ইঞ্চ্ হয়, তাহাহইলে বিস্তৃত রন্ধ্রের পরিমাণ ফল $\frac{১১}{১৪}$ এর সহিত সূক্ষ্ম রন্ধ্রের পরিমাণ ফল $\frac{১১}{১৪০০}$ এই দুইয়ের যে অনুপাত, সূক্ষ্ম মুখ বিনির্গত শব্দও বিস্তৃত মুখ নিঃসৃত শব্দ হইতে সেই অনুপাতে অর্থাৎ ১০ গুণ অধিক উচ্চ হইয়া বিনিঃসৃত হইবে।

স্পন্দিত-বায়ু আমাদিগের কর্ণমধ্যেও গমন-কালে ঘনীভূত হইতে থাকে। কর্ণদল বেণুর বিস্তৃত মুখের কার্য্য করে। উহার উপরিভাগে যত গুলি শব্দায়মান বায়ু-তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা বহিস্পথের বিস্তৃত মুখ দিয়া কর্ণমধ্যে প্রবেশ করে। বহিস্পথ আরম্ভে যত প্রশস্ত উহার পরভাগ তাহা অপেক্ষা অনেক অপরিসরিত। সুতরাং ঐ সকল তরঙ্গ তম্মধ্যে যত প্রবেশ করে, ততই ঘনীভূত হইয়া উচ্চ-শব্দ জননের ক্ষমতা-বিশিষ্ট হয়। বহিস্পথের কর্ণা-ন্তরীণ-মুখ পটহচ্ছদে নিঃশেষিত হইয়াছে, সুতরাং বায়ু বহিস্পথ দিয়া গমন করিয়া পটহচ্ছদে আহত ও তাহাকে ব্যাধূত করিতে থাকে। পটহচ্ছদের স্পন্দন-ক্রিয়া কর্ণান্তরীণ শৃঙ্খলিত অস্থিপরম্পরা দ্বারা অণ্ড-বিলচ্ছদে প্রেরিত হয়। কিন্তু ঐ শৃঙ্খলিত অস্থিই শব্দায়মান তরঙ্গ সঞ্চালনের কেবল মাত্র উপায় নহে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, পটহচ্ছদ সম্পূর্ণভাবে

নষ্ট হইলেও শ্রবণ-কার্য্যের তাদৃশ ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু তল্লগ্ন শৃঙ্খলিত অস্থিনিচয় শব্দায়মান হিল্লোল প্রেরণের কেবল মাত্র কারণ হইলে পটহচ্ছদ অভাবে শ্রবণ-ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইত। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, কেবল মধ্যকর্ণস্থ বায়ু দ্বারাই শব্দায়মান তরঙ্গ অন্তঃকর্ণে প্রেরিত হইতে পারে। গোলবিলচ্ছদেরও শব্দ বোধনের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাহার সহিত ঐ অস্থিময় শৃঙ্খলের কোন সংযোগ নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা উহাতে শব্দায়মান তরঙ্গ প্রেরিত হয় না। কেবল মধ্যকর্ণের বায়ুযোগেই ঐ কার্য্য হইয়া থাকে। এইরূপে বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ স্পন্দিত-বায়ু একত্রিত, ঘনীভূত ও অন্তঃকর্ণে প্রেরিত করিয়া শব্দজ্ঞান জননের সহায়তা করিয়া থাকে। অন্তঃকর্ণেই শব্দজ্ঞান জননের প্রধান ক্রিয়া হয়। অন্তঃকর্ণ যে তরল পদার্থে পরিপূর্ণ তাহা অসংকোচ্য। অতএব অণ্ডবিল লগ্ন শৃঙ্খলিত অস্থি পরম্পরা অথবা মধ্যকর্ণস্থ বায়ু দ্বারা কিংবা ঐ উভয় দ্বারা অণ্ডবিল ও গোলবিলচ্ছদোপরি উপস্থাপিত শব্দায়মান হিল্লোল ঐ তরল পদার্থে সম্বাহিত হইলে তদ্দ্বারা শ্রবণ-স্নায়ুতে প্রেরিত হয়, তাহাতেই শব্দ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

কোন কোন ব্যক্তির শ্রবণ জ্ঞান জন্মে না। ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে বধির কহে। কাহারও অতি

অল্পমাত্র শ্রবণ জ্ঞান জন্মে। যে সকল লোক ভালরূপ শুনিতে না পায়, চিকিৎসকেরা শৃঙ্গাকার যন্ত্র বিশেষ সংযোগ করিয়া তাহাদিগের শুক্তিদেশের বিস্তৃতি ও বহিষ্পথের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি করিয়া কর্ণের শ্রবণ শক্তি প্রবল করিয়া দিয়া থাকেন। কোন কোন লোক শুনিবার সময় মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে। মুখের মধ্য দেশের সহিত কর্ণের সংযোগ-পথ আছে। মুখ ব্যাদান করিলে স্পন্দিত বায়ু সেই পথে কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রবণ ক্রিয়ার আনুকূল্য করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্বর।

স্বর বিষয়ে করুণাবান্ পরমেশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না। প্রায় সকল জীবেরই বিশেষ বিশেষ স্বর আছে; কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই, পৃথিবীস্থ অনন্ত কোটি স্বরবান্ জীবের মধ্যে একের স্বরের সহিত অন্যের স্বরের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হয় না। স্বরবান্ জন্তু মধ্যে যেমন জাতিভেদে স্বরভেদ আছে, তেমনি একজাতীয় জীব মধ্যে সকলেরই

পৃথক্ পৃথক্ স্বর আছে। আমরা যে ব্যক্তির স্বরের পরিচয় পাইয়াছি, সহস্র লোকের মধ্যেও তাহার স্বর শ্রবণ করিয়া তাহাকে চিনিয়া লইতে পারি।

স্বর বিষয়ে করুণানিধান বিশ্বপাতার দয়া প্রকাশের শেষ নাই। তিনি আমাদিগের সুখের নিমিত্ত কত প্রকার সুমধুর স্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। বসন্ত কালে কোকিলাদি সুস্বর বিহঙ্গমগণের কলরব শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ কতই উল্লসিত হয়; সুধাময় সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে দুঃখ শোক সন্তপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ও প্রফুল্ল হইয়া থাকে। কেবল মনুষ্যের পক্ষে কেন? সঙ্গীতের এমনি মোহিনী শক্তি যে, অবোধ পশুপ্রভৃতিও তৎকর্ত্তৃক বশীভূত হয়। যে মৃগ ব্যাধদর্শন মাত্র ভয়চকিত মনে পলায়ন করে, সেও গীত শব্দে সংরুদ্ধ হইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে। দংশনব্যগ্র বিষধর ভুজঙ্গও বেণুবিশেষের ধ্বনির বশীভূত হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। ফলতঃ সঙ্গীতের বশীকরণ-প্রভাব ঐন্দ্রজালিকবৎ প্রতীয়মান হয়। সঙ্গীতরসের মোহিনী-শক্তি-বশীভূত হইয়া লোকে তদ্দ্বারা বারিবর্ষণ, অগ্নিজ্বলন, পাষাণ দ্রব হওয়া প্রভৃতি অনেক অসম্ভাব্য ব্যাপার সংঘটনও কল্পনা করিয়াছে।

স্বরযন্ত্র—যে যন্ত্রদ্বারা স্বরের উৎপত্তি হয়, তা-

হাকে স্বরযন্ত্র কহে। অধঃস্থ চোয়ালের অব্যবহিত নিম্নে গ্রীবার উপরিভাগে কোণাকার যে সচল অস্থি আছে, তাহাতেই স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ সংলগ্ন আছে। স্বরযন্ত্রও কিছু কিছু সঞ্চালিত হইতে পারে। স্বরযন্ত্রে চারিখানি উপাস্থিক পদার্থ আছে—ঐ পদার্থ চতুষ্টয় তল্লগ্ন পেশীদ্বারা সঞ্চালিত হইতে পারে।

স্বরজনন বিষয়ে স্বরযন্ত্রের যে ভাগ মুখ্যরূপে কার্য্যকারী তাহা দুইটী পর্দ্দাবিশেষ—ঐ পর্দ্দাদ্বয়কে স্বারতন্ত্র কহে। স্বারতন্ত্রদ্বয় কণ্ঠনালী-মুখে সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে এরূপে বিস্তৃত আছে যে, তদুভয়ের মধ্যদিয়া বায়ু গমনাগমনের দীর্ঘাকার একটী অবকাশ আছে—ঐরূপ ব্যবস্থাপিত অবকাশকে স্বর-প্রভব কহে। প্রত্যেক স্বারতন্ত্র কণ্ঠনালীমুখের কিঞ্চিদূন অর্দ্ধেক ভাগ আবৃত করিয়াছে।

স্বারতন্ত্র দ্বয়ের উপরিভাগে আর দুইটী পর্দ্দা আছে—তাহাদিগকে অপতন্ত্র কহে। স্বরযন্ত্রের উপরিভাগে একখানি কপাট বিশেষ আছে—তাহাকে অধোজিহ্বিকা কহে। ভক্ষ্য বা পানীয় গলাধঃকরণ কালে অধোজিহ্বিকা স্বরযন্ত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহাতে ঐ সকল সামগ্রীর প্রবেশ নিরোধ করে।

স্বরোৎপত্তি—পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, শব্দ জনক পদার্থের দ্বারা বায়ু প্রকার বিশেষে স্পন্দিত

হইলে শব্দোৎপত্তি হয়। কণ্ঠোদ্গত শব্দকে স্বর কহা যায়। বায়ু ফুস্ফুস হইতে কণ্ঠনালী দিয়া নির্গমন কালে স্বারতন্ত্র প্রকার বিশেষে কম্পিত করে, সেই কম্পনদ্বারা বায়ু স্পন্দিত হইয়া স্বরোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক প্রশ্বাসক্রিয়া কালে শব্দের উৎপত্তি হয় না। যখন শব্দোৎপত্তির কোন প্রয়োজন না থাকে, তখন স্বর-প্রভব অবকাশ এরূপ বিস্তৃত থাকে যে, তন্মধ্য দিয়া বায়ু বহির্গমনে স্বারতন্ত্র স্পন্দিত হয় না; সুতরাং বায়ুতেও শব্দজনক তরঙ্গ উপস্থিত হয় না। কিন্তু চেষ্টা বিশেষদ্বারা স্বরপ্রভবাবকাশ সঙ্কুচিত ও স্বারতন্ত্র স্বরোৎপাদনোপযুক্ত আকৃষ্ট হইলে বায়ু নির্গমনকালে স্বারতন্ত্র কম্পিত হইয়া শব্দজনক ক্রিয়ার সমুদায় অঙ্গ সম্পন্ন করে; তাহাতেই শব্দ উৎপত্তি হইতে থাকে। স্বরের উচ্চতা, স্বর-প্রভবাবকাশের আয়তন ও স্বারতন্ত্রের আকর্ষিত অবস্থার উপরি নির্ভর করে; অর্থাৎ ঐ অবকাশ যত অল্প পরিসর এবং স্বারতন্ত্র অধিক আকৃষ্ট হয়, স্বর তত উচ্চ হইয়া থাকে; এবং ঐ অবকাশ যত বৃহৎ ও স্বারতন্ত্র অল্পাকৃষ্ট থাকে, স্বর তত অনুচ্চ হয়। স্বরের উচ্চতা ও নীচতা ঐরূপে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহার অপরাপর লক্ষণ ভেদ, বাহ্যবায়ুর সহিত স্পন্দিত বায়ুর মিলনের পূর্ব্বে উহা

যে সকল স্থান দিয়া বহির্গত হয়, সেই সকল স্থানের অর্থাৎ মুখ, গলগুহা, নাসাপ্রভৃতির আকার ও আয়তন ভেদানুসারে ঘটিয়া থাকে।

স্বর-প্রভবের আকার, নির্ম্মাণ-প্রণালী ও স্বরোৎপত্তির প্রকরণ, এইরূপে সহজে বুঝা যাইতে পারে। একটী নলের মুখে দুইখণ্ড রবার এরূপে রাখ যে, তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা নলের মুখের অর্দ্ধেকের কিছু অল্পভাগ আচ্ছাদিত হয়। তাহার পর, ঐ নলের অধোমুখের নিম্নে একটী ভস্ত্রাদ্বারা বায়ু প্রবেশিত করিয়া দাও। তাহা হইলে যদি উভয় রবারের মধ্যস্থ অবকাশ নিতান্ত প্রশস্ত না হয়, তবে তদ্দ্বারা জন্তুবিশেষের স্বরের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিবে। যদি এরূপ কোন উপায় করা যায় যে, রবার ইচ্ছানুসারে আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ আকর্ষণের ন্যূনাধিক্যানুসারে তদুৎপন্ন শব্দ নীচ বা উচ্চ হইবে। আমাদিগের স্বর ঐরূপে উৎপন্ন হয়। কণ্ঠনালী ঐ নলের কার্য্য করে; স্বারতন্ত্র, নলোপরিস্থ রবারের অনুরূপ; ফুস্ফুস ভস্ত্রাস্বরূপ; এবং স্বারতন্ত্রের মধ্যগত অবকাশ নলোপরিস্থ উভয় রবারের মধ্যগত ফাটলবৎ অবকাশের প্রতিরূপ। ভস্ত্রারূপ ফুস্ফুস দ্বারা বায়ু প্রয়োজনানুরূপ অল্প বা অধিক বলে চালিত, স্বরযন্ত্রের পেশীবলে স্বারতন্ত্র অধিক বা অল্প

আকৃষ্ট ও স্বর-প্রভবাবকাশ অল্প বা অধিক পরিসারিত হইয়া নানাবিধ স্বরোৎপত্তি সম্পাদন করে।

পরীক্ষা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, যাহাকে স্বরযন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহাই কেবল স্বরোৎপাদনের একমাত্র উপায়। কণ্ঠনালী ও তদধঃস্থ শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য অংশ কেবল বায়ুচালনা করিয়া তৎকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে; এবং মুখগহ্বর ও নাসা, স্বরের রূপগত অনেক লক্ষণ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ রূপগত লক্ষণ কেবল ঐ ঐ স্থানদ্বারা জন্মিয়া থাকে, এমত নহে; বক্ষঃ ও মস্তকস্থ তরল বা কঠিন উভয়বিধ পদার্থ সকল কম্পিত হইয়া তাহার অনেক রূপ সম্পন্ন করে। শরীরলগ্ন অপরাপর বাহ্যপদার্থের সংযোগেও তাহার অনেক লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। যদি স্বরযন্ত্রের নিম্নে কণ্ঠনালীর কোন স্থানে ছিদ্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রশ্বসিত বায়ু স্বর প্রভবাবকাশ দিয়া না গিয়া অগ্রেই বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে কোনরূপ শব্দ উৎপাদিত হয় না। আবার, যদি স্বরপ্রভবাবকাশের উপরি ছিদ্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বায়ু স্বরপ্রভবাবকাশ মধ্য দিয়া গমন করিয়া তদুপরিস্থ ছিদ্রপথে বহির্গত হইলেও শব্দোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মুখগহ্বর, গলগুহা ও নাসাপথ দিয়া নির্গত হইলে স্বরের যে

যে লক্ষণ থাকিত ঐরূপ নির্গত হওয়ায় সেরূপ লক্ষণের অনেক ব্যত্যয় হয়।

শরীরের যে সকল অংশের স্পন্দন ক্রিয়ায় বা সহায়তায় স্বরোৎপত্তি হয়, তৎসমুদায় জাতিভেদে ও ব্যক্তিভেদে পৃথক্ পৃথক দেখাযায়; সুতরাং তন্নিবন্ধন দুই ব্যক্তির স্বর যে একরূপ হয় না, স্বরদ্বারা অদৃষ্ট বক্তাকে চিনিতে পারা যায়, স্ত্রী পুরুষ, পৃথক করা যায় এবং বয়সও নির্ণীত হইয়া থাকে; ইহা চমৎকারের বিষয় নহে। শরীরের ঐ ঐ অংশের ভিন্নাকার ও ভিন্নায়তন প্রযুক্ত বৃদ্ধ অপেক্ষা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির, শিশু অপেক্ষা যুবার এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের স্বরগত অনেক ভিন্ন লক্ষণ হইয়া থাকে।

স্বরের সংযোগ বিশেষ দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি হয়। বাক্য কথন কেবল মনুষ্যেরই অধিকৃত। জগন্নিয়ন্তা এই অনুপম অনুগ্রহ পৃথিবীস্থ আর কোন জীবকেই প্রদান করেন নাই। আমরা বাক্যদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি বলিয়াই অন্যান্য জীব অপেক্ষা আমাদিগের এত প্রাধান্য ও এত সৌভাগ্য হইয়াছে। নির্ব্বাক্ হইলে তাহাদিগের সহিত আমাদিগের অল্প বিশেষ থাকিত। মূক ও বধির ব্যক্তিরা বাক্শক্তি বিহীনতা-প্রযুক্ত যে কত কষ্ট পায় তাহা অনুভব করিতেও পারা যায় না। বধির ব্যক্তি শ্রবণ-

শক্তি অভাবে, কিরূপে কথা কহিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে পারে না; মূকেরা বাগনুকরণের ক্ষমতা অভাবে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া থাকে। জন্মজড় ব্যক্তিরা স্বরোৎপত্তির সমুদায় যন্ত্র সম্পন্ন হইলেও অস্পষ্ট চীৎকার স্বরভিন্ন অন্যপ্রকার শব্দ করিতে পারে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শরীরের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও হ্রাস।

যেরূপ জীবন সঞ্চার হয়, তাহা অনির্ণেয় হইয়া আছে। কেবল যেরূপে জীব জন্মে, ও যেরূপে তাহার অবয়ব সংস্থান, বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, পণ্ডিতেরা তাহাই স্থির করিয়াছেন। সকল জন্তুর জন্ম প্রকরণ একরূপ নহে। কোন জন্তু গর্ভাশয় হইতে স্বাকারে নির্গত হয়, কেহবা ডিম্বাকারে নিঃসৃত হইয়া পরে স্বাকার প্রাপ্ত হয়। জননীর গাত্রের অংশ বিশেষ বর্দ্ধিত ও উপযুক্ত সময়ে স্খলিত হইয়া কোন জন্তু উৎপন্ন হয়, কোন জন্তুর শরীর বিভক্ত ও পৃথক্‌ভূত হইয়া অপর এক জন্তু উদ্ভব হইয়া থাকে। যাহাহউক, মনুষ্য, গো, অশ্ব, পক্ষী প্রভৃতির জন্মরীতি প্রায় একরূপ। তাহা-

দিগের সকলেরই আদিম অবস্থা ডিম্ব। কিন্তু মাতৃ-গর্ভ্ভ হইতে প্রসূত অণ্ড উদ্ভেদ করিয়া যে সকল জীব জন্মে তাহাদিগকে সামান্যতঃ অণ্ডজ কহে। আর গর্ব্ভাশয় মধ্যেই অণ্ড প্রোদ্ভেদ করিয়া যাহারা ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে।

মনুষ্যেরা জরায়ুজ-শ্রেণী-ভুক্ত। মনুষ্যশরীর-মধ্যে যে স্থানে গর্ত্ত সঞ্চার হয়, তাহাকে গর্ব্ভাশয় কহে। গর্ত্ত প্রথমে ডিম্বাকার থাকে। প্রথমে ডিম্বের পরিমাণ এক ইঞ্চির প্রায় ২০০ ভাগের ভাগ পরিমিত থাকে। ডিম্ব প্রথমে যে বেষ্টন মধ্যে থাকে তাহাকে ডিম্বকোষ কহে। ডিম্ব কিছুকাল স্বীয় কোষ মধ্যে থাকিয়া তাহা উদ্ভেদ করিয়া একটী নলাকার পদার্থ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ঐ নলকে কালল-নল কহে। ডিম্ব ঐ নলমধ্যে কিছুকাল অবস্থান করিয়া গর্ব্ভাশয়ের অংশা-ন্তরে যায়, এবং তথায় ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। শরীরের মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে এক একটী ডিম্বাশয়, কালল-নল, প্রভৃতি গর্ব্ভ-সামগ্রী আছে।

গর্ব্ভাশয় মধ্যে যে রূপে ডিম্ব জ্রণরূপে পরিণত হয়, যেরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার হস্ত, পাদ, চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্ক পাকাশয়, নখ, কেশ প্রভৃতি শরীরগত অংশ সমু-দায় উৎপন্ন হয়, তাহা সাতিশয় বিস্ময়কর। একটী সামান্য ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দেখিলে উহাতে কেবল পীত

ও শুভ্রবর্ণ পদার্থ-বিশেষ লক্ষিত হয়, পরন্তু তাহা যে কিছুকাল পরে জীব-বিশেষের শরীর রূপে পরিণত হইবে, এবং তাহার কিয়দংশ চর্ম্ম, কিয়ৎভাগ মাংস, কতক নখ, কতক কেশ, কোনভাগ চক্ষু কোনভাগ কর্ণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ-রূপে প্রকাশ পাইবে, তাহা কাহারও বুদ্ধিতেও আইসে না। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তিনি ডিম্বমধ্যে শরীরজনক ভৌতিক পদার্থ সমুদায় রক্ষা করিয়াছেন, উপযুক্ত কালে তৎসমুদায় রূপান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের শরীর উৎপাদন করে। যে রূপে ডিম্বগত পদার্থের রূপান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহা সহজে বোধগম্য নহে, সুতরাং এস্থলে তাহার বিবরণ করা যাইবে না।

যখন জরায়ু মধ্যে অবস্থিত জীবের এমত অবস্থা উপস্থিত হয় যে, উহা পৃথিবীতে অবস্থানের উপযুক্ত হইয়া উঠে; তখন উহা তত্রত্য পেশীবলে গর্ত্ত হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়। উহাকে নির্গত করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের কোন রূপ সাহায্য আবশ্যক করে না। তবে যে প্রসবকালে লোকে ধাত্রীদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা সকল স্থলে প্রয়োজনীয় নহে। জগন্নিয়ন্তার ব্যবস্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিশেষ অবহেলন জন্য যেখানে গর্ব্বাশয়-

মধ্যে বালকের যথোপযুক্ত রূপে অবস্থানের ব্যত্যয় হইয়া যায়, সেই স্থলেই ধাত্রীর প্রয়োজন করে। ধাত্রীর সহায়তা ভিন্ন সুখপ্রসবের দৃষ্টান্ত স্থল আমাদিগের দেশীয় বন্য জাতীয়-দিগের মধ্যে অভাব নাই। পশ্বাদির প্রসব-ক্রিয়াও ঐ বিষয়ের সার্ব্বত্রিক প্রমাণ। বরং কোন কোন স্থলে ধাত্রীদিগের মূর্খতা দোষ-হেতু গর্ব্ভাশয় হইতে নিঃসরণোন্মুখ সন্তানও বিঘ্নিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে মূর্খধাত্রী দ্বারা সন্তান-প্রসব-রীতি যে কত দূর ভয়াবহ, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। উহারা যে গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, তাহার কিছুই জানে না। গর্ব্ভ-মধ্যে কিরূপে সন্তান অবস্থান করে, তৎকালে উহার শরীরের কিরূপ ভাব থাকে, ভূমিষ্ঠ হইলে উহাকে কিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, উহারা তাহার অণু-মাত্রও জ্ঞাত নহে। ফলতঃ আমাদিগের দেশের প্রসব প্রকরণ ও শিশুপালন সন্দর্শন করিলে তৎকালে এই মনে হয়, হতভাগ্য জীবগণ আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের গর্ব্ভে যেন আর আগমন না করে। এখানে চিরাচরিত কুপ্রথা-মূলক বাটীর মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থানে অরিষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রসব-কালে মূর্খ ধাত্রীর সহায়তা গৃহীত হয়, সুতরাং তন্নিবন্ধন হয়ত যে সন্তান বিনা সাহায্যে সুখে প্রসূত হইত,

তাহারও প্রসব ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। দু-র্ভাগ্য ক্রমে যাহার গর্ব্ভে সন্তানাবস্থানের ব্যতিক্রম হয়, তাহার ত, জীবনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাহার প্রসব-কালীন রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলে অন্তঃ-করণ দুঃখ-স্রোতে আপ্লাবিত হইতে থাকে। যে স্থলে তাহার প্রশমনের জন্য ইংরেজ ধাত্রীদিগের সহায়তা লভ্য হয়, সে স্থলেও কাল দেশাচার তাহার অন্তরায় হয়। গর্ব্ভিণী-যন্ত্রণা নিনাদে গৃহ আকুলিত হইলেও তাহার প্রতীকারার্থ কয়েকটা পিশাচ-মন্ত্র ভিন্ন আর কোন উপায়ই অবলম্বিত হয় না। সৌভা-গ্যক্রমে যদি সন্তানটী জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও তাহার সংরক্ষণ জন্য ন্যায়গ্রাহ্য কোন যত্নই গৃহীত হয় না, পীড়া হইলে অমূলক ভূত প্রেতা-দির আবির্ভাব বলিয়া ব্যাখ্যাত ও তদনুসারে ভূত-বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হয়। ভূতবৈদ্যগণ চিকিৎসা-কালে শিশুদিগকে যত যন্ত্রণা প্রদান করে, তাহা লিখিতে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। উহারা কুসুম-সুকুমার শিশু-শরীর চর্ম্ম দ্বারা বন্ধন করে, কখন তাহাদিগের পাদ বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে ঊর্দ্ধপদ ও অধোমুখ করিয়া লম্বমান রাখে, জ্বলন্ত চুল্লীর উপরি সংস্থাপিত তৈলকটাহের উপরি ধরিয়া শরীর দগ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যেই

ভূলোকের জ্যোতি নিরীক্ষণ না করিতে করিতে সন্তান-কাতরা অর্দ্ধমৃতা জননীর অঙ্ক-শয্যা হইতে শিশু-দিগকে অনন্তশয্যা গ্রহণ করাইয়া থাকে। হা! কত-দিনে যে এ দেশের কুপ্রথা উন্মূলিত হইবে, কতদিনেই বা এদেশে বোধ-সূর্য্যোদয় হইবে, হে জগদীশ তাহা তুমিই জান!

ভূমিষ্ঠ হইবার সময় ভ্রূণের অবস্থার অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বালক যে পৃথিবীতে বাস করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে তাহারই উপযোগী করিবার নিমিত্ত ঐ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ভ্রূণ মাতৃগর্ভে একপ্রকার তরল পদার্থে ভাসমান থাকে। তথায় মাতৃ-শরীরের সহিত নাভি-নাড়ীর সংযোগে ভ্রূণের রক্ত সংস্কার হয়। ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার সম্পূর্ণ ভিন্নাবস্থা উপস্থিত হয়। তখন উহার শ্বাস-কার্য্যারম্ভ হয়। তদ্দ্বারা ফুস্ফুসের আ-কার প্রসারিত হয়। ভ্রূণের ফুস্ফুস লোহিতবর্ণ, অপেক্ষাকৃত ভারবিশিষ্ট ও ঘন থাকে; ভূমিষ্ঠ হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইলে বায়ুপ্রবেশে উহা স্ফীত, প্রসারিত, সুতরাং অল্পভার হয়। পরীক্ষাদ্বারা অব-ধারিত হইয়াছে, ভ্রূণের ফুস্ফুস জলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর ফুস্ফুস ভাসিয়া উঠে।

ভূমিষ্ঠ হইয়া নিশ্বাস গ্রহণই শিশুর প্রথম কার্য্য। বয়োবৃদ্ধি হইলে যৎপরিমাণে শ্বাসক্রিয়া হইয়া থাকে, শৈশবকালে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শিশুদিগের প্রতিমিনিটে ৩০ হইতে ৪০ বার পর্য্যন্ত শ্বাসক্রিয়া হয়, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ১৫ হইতে ১৮ বার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐরূপ হইবার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। তদ্দ্বারা উহাদিগের শরীরে অধিক পরিমাণে তাপ জন্মে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীর যত ভারী ও তাহার যতভাগ বাহ্যবায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, তাহা ধরিলে শিশুদেহের ভারানুসারে উহার শরীরের অধিক ভাগ বাহ্যবায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে; সুতরাং তন্নিবন্ধন বাহ্যবায়ুর সংযোগে উহার শরীর হইতে অধিক পরিমাণে তাপ বহির্গত হয়; অতএব তাহা পোষাইবার জন্য উহার শরীরে অধিক পরিমাণে তাপ জন্মিয়া থাকে। অধিকন্তু, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশু-শরীর বর্দ্ধনশীল; শরীর বৃদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র শীঘ্র রক্তসঞ্চার আবশ্যক। বাস্তবিকও তাহাই হইয়া থাকে। জন্মাবধি দুই মাস বয়সের মধ্যে শিশুদিগের ধমনী স্পর্শ করিলে রক্তসঞ্চার-মূলক প্রতিমিনিটে ১৪০ বার করিয়া তাহা আমাদিগের অঙ্গুলিতে আঘাত করিয়া থাকে। যত বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই ঐরূপ আঘাত-সংখ্যার হ্রাস

হয়। ষষ্ঠমাসে ১২৮, দ্বাদশমাসে ১২০, দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ১১০, এবং পূর্ণ বয়সে ৮০ হইতে ৭৫ বার ঐরূপ আঘাত অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং শিশুশরীরে যেমন শীঘ্র শীঘ্র রক্তসঞ্চার হয়, তেমনি ত্বরায় উহার সংস্কার জন্য শীঘ্র শীঘ্র শ্বাসক্রিয়াও হইয়া থাকে।

উপরি লিখিত হইয়াছে, শিশু-শরীরে শীঘ্র শীঘ্র রক্তসঞ্চার হয়। রক্ত খাদ্য হইতেই জন্মে। সুতরাং শিশুশরীরে সত্বর রক্তসঞ্চার সম্পাদন জন্য, অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থ ভোজন করা উহাদিগের আবশ্যক। তদনুসারে তাহাদিগের শীঘ্র শীঘ্র ক্ষুধা হয়, ও তাহারা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইলে কিছুকাল পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যই উহাদিগের একমাত্র জীবন ধারণের উপায় থাকে। অতএব সহজেই বোধ হইতে পারে, রক্তে যে পরিমাণে শরীর-পোষক পদার্থ থাকে, স্তন্যেও সেই পরিমাণে ঐ পদার্থ থাকিবে। পরীক্ষা দ্বারাও তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। পূর্ব্বে অণুবীক্ষণ দ্বারা রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যেরূপ প্রণালী নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, যদি এক বিন্দু দুগ্ধ লইয়া সেইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তবে উহাতেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাভ গোলক দৃষ্ট হইবে। ঐ সকল গোলকের কেন্দ্র

হইতে আলোক অতি ঔজ্জ্বল্য সহকারে প্রতিফলিত হইতে দেখা যাইবে; এবং তাহাদিগের ব্যাসপরিমাণ এক ইঞ্চের ১২৫০০ হইতে ৩০০০ ভাগের ভাগ লক্ষিত হইবে। স্তন্যস্থ ঐরূপ গোলকের সংখ্যা সকল ব্যক্তিতে এবং এক ব্যক্তিতে সকল সময়ে সমান থাকে না। শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, দুগ্ধে যে সকল মুক্তাভ গোলক ভাসমান দেখা যায়, তাহা হইতেই নবনীত জন্মে, এবং যে তরল পদার্থে তাহারা ভাসমান থাকে তাহা হইতে পনীর প্রস্তুত হয়। ঐ তরল পদার্থে চিনি ও শতকরা ৮০ হইতে ৯০ অংশ জল আছে; তদ্ভিন্ন উহাতে কিছু লবণের ভাগও আছে। গো, মেষ, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তু অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্তন্যে নবনীত-জনক পদার্থের ভাগ অধিক। ১০০.০০ স্ত্রীলোকের স্তন্যে ৮.৯৭, গোদুগ্ধে ২.৬৮, ছাগদুগ্ধে ৪.৫৬, এবং গর্দ্দভদুগ্ধে ১.২৯ নবনীত জনক পদার্থ আছে। চিনি-র ভাগ গো ও গর্দ্দভদুগ্ধে প্রায় তুল্য; ছাগদুগ্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক এবং মনুষ্য-দুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। পানীয় পদার্থ গোদুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ছাগদুগ্ধে তাহা অপেক্ষা ন্যূন; গর্দ্দভ ও স্ত্রীলোকের দুগ্ধে তাহা অপেক্ষাও অল্প। জলের ভাগ গর্দ্দভদুগ্ধে অধিক; স্ত্রীলোক, গো ও ছাগদুগ্ধে ক্রমান্বয়ে তাহা অপেক্ষা

ন্যূন। কিন্তু যে দুগ্ধে নবনীতজনক পদার্থের ভাগ অধিক তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। অতএব স্ত্রীলোকের স্তন্য অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা পুষ্টিসাধক।

শিশুরা ৬। ৮ মাস পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিয়া প্রাণ ধারণ করে, তাহার পরেই তাহাদিগকে অন্যান্য দ্রব্য কিছু কিছু দেওয়া গিয়া থাকে। ঐ সময়ে আ-হার দিবার রীতি সকল স্থানে সমান নহে। তৎকালে তাহাদিগকে সুখপাচ্য পেয় দ্রব্য দেওয়াই আবশ্যক। ১৫ হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুদিগের অনেক গুলি দন্ত উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে; তখন উহাদিগের চর্ব্বণশক্তি জন্মে, এবং জঠরাগ্নিও যে চর্ব্ব্য পরিপাকে সক্ষম হইয়াছে তাহা ঐ দন্ত উদ্ভেদনেই প্রকাশ পায়। তখন উহাদিগকে স্তনপান পরিত্যাগ করাইয়া কিছু কিছু চর্ব্ব্য দেওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু পেয় দ্রব্য পরিত্যাগ করাইয়া চর্ব্ব্য সামগ্রী ভোজন করিতে দিবার সময় বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অল্পে অল্পে তাহার জঠরাগ্নিতে ঐ সকল দ্রব্যের পরিপাক করাইতে হয়। সহসা তাদৃশ চেষ্টা করিলে শিশুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপে যেমন স্বাদেন্দ্রিয় ও চর্ব্বণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, সেইরূপ পাকাশয়েরও অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। আমাশয় অপেক্ষাকৃত

হইতে আলোক অতি ঔজ্জ্বল্য সহকারে প্রতিফলিত হইতে দেখা যাইবে; এবং তাহাদিগের ব্যাসপরিমাণ এক ইঞ্চের ১২৫০০ হইতে ৩০০০ ভাগের ভাগ লক্ষিত হইবে। স্তন্যস্থ ঐরূপ গোলকের সংখ্যা সকল ব্যক্তিতে এবং এক ব্যক্তিতে সকল সময়ে সমান থাকে না। শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, দুগ্ধে যে সকল মুক্তাভ গোলক ভাসমান দেখা যায়, তাহা হইতেই নবনীত জন্মে, এবং যে তরল পদার্থে তাহারা ভাসমান থাকে তাহা হইতে পনীর প্রস্তুত হয়। ঐ তরল পদার্থে চিনি ও শতকরা ৮০ হইতে ৯০ অংশ জল আছে; তদ্ভিন্ন উহাতে কিছু লবণের ভাগও আছে। গো, মেষ, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তু অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্তন্যে নবনীত-জনক পদার্থের ভাগ অধিক। ১০০.০০ স্ত্রীলোকের স্তন্যে ৮.৯৭, গোদুগ্ধে ২.৬৮, ছাগদুগ্ধে ৪.৫৬, এবং গর্দ্দভদুগ্ধে ১.২৯ নবনীত জনক পদার্থ আছে। চিনি-র ভাগ গো ও গর্দ্দভদুগ্ধে প্রায় তুল্য; ছাগদুগ্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক এবং মনুষ্য-দুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। পানীয় পদার্থ গোদুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ছাগদুগ্ধে তাহা অপেক্ষা ন্যূন; গর্দ্দভ ও স্ত্রীলোকের দুগ্ধে তাহা অপেক্ষাও অল্প। জলের ভাগ গর্দ্দভদুগ্ধে অধিক; স্ত্রীলোক. গো ও ছাগদুগ্ধে ক্রমান্বয়ে তাহা অপেক্ষা

ন্যূন। কিন্তু যে দুগ্ধে নবনীতজনক পদার্থের ভাগ অধিক তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। অতএব স্ত্রীলোকের স্তনা অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা পুষ্টিসাধক।

শিশুরা ৬। ৮ মাস পর্য্যন্ত মাতৃস্তনা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করে, তাহার পরেই তাহাদিগকে অন্যান্য দ্রব্য কিছু কিছু দেওয়া গিয়া থাকে। ঐ সময়ে আ-হার দিবার রীতি সকল স্থানে সমান নহে। তৎকালে তাহাদিগকে সুখপাচ্য পেয় দ্রব্য দেওয়াই আবশ্যক। ১৫ হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুদিগের অনেক গুলি দন্ত উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে; তখন উহাদিগের চর্ব্বণশক্তি জন্মে, এবং জঠরাগ্নিও যে চর্ব্ব্য পরিপাকে সক্ষম হইয়াছে তাহা ঐ দন্ত উদ্ভেদনেই প্রকাশ পায়। তখন উহাদিগকে স্তনপান পরিত্যাগ করাইয়া কিছু কিছু চর্ব্ব্য দেওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু পেয় দ্রব্য পরিত্যাগ করাইয়া চর্ব্ব্য সামগ্রী ভোজন করিতে দিবার সময় বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অল্পে অল্পে তাহার জঠরাগ্নিতে ঐ সকল দ্রব্যের পরিপাক করাইতে হয়। সহসা তাদৃশ চেষ্টা করিলে শিশুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপে যেমন স্বাদেন্দ্রিয় ও চর্ব্বণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, সেইরূপ পাকাশয়েরও অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। আমাশয় অপেক্ষাকৃত

বক্র হইয়া অবস্থিতি করে; উহার পরিসর বৃদ্ধি হয় এবং বৃহৎ অন্ত্র অধিক আয়ত হইতে থাকে। যকৃৎ এবং মেটেও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু পাকাশয় ও অন্ত্র অপেক্ষা উহাদিগের বৃদ্ধি অল্পে অল্পে হয়। মূত্রাশয়ও সেই সময়ে বস্তিদেশে নামিয়া যায়।

ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুরা চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারে; কিন্তু পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, তৎকালে উহাদের দর্শনজ্ঞান জন্মে না। কতিপয় সপ্তাহ অন্তে ঐ শক্তি জন্মে। ঐ শক্তি জন্মিলে যে সকল বস্তু বিশেষরূপ উজ্জ্বল বা গাঢ়বর্ণে বর্ণিত, সেই সকল বস্তুই উহার প্রথম লক্ষ্য হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ চিনিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাদিগের পরস্পর দূরত্ব বা আকারের তারতম্য বোধ অনেক দিন গত না হইলে হয় না।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে চালনাদ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত শিশুর এক প্রকার অস্ফুট ধ্বনি ভিন্ন আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ অবলোকনে উহার আনন্দানুভব হইতে থাকে, সেই অন্তঃস্থ আনন্দ কেবল ঈষদ্ধাস্য দ্বারা প্রকাশ পায়। তাহার পর উহার অনন্বিত ধ্বনিমধ্যে অস্ফুট শব্দবিশেষ ও বাক্য কথনের চেষ্টা বিশেষ লক্ষিত হইতে

থাকে, এবং এক বৎসর বয়সে একাক্ষর বা অসংযুক্ত দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর শব্দ শুনা যায়। ভূমিষ্ঠকালে শিশু-শরীরের অস্থি সকল উপাস্থিবৎ কোমল থাকে। উহাদ্বারা তাহার শরীর-ভার বাহিত হয় না। ক্রমে ক্রমে খাদ্য দ্রব্য হইতে ঐ সকল অস্থিতে চূর্ণের সংযোগ হইতে থাকে, তাহাতেই অস্থি সকল কঠিন হয়। অস্থির কাঠিন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তৎসঞ্চালক পেশীদিগেরও আকার ও বল বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং এক বৎসর বয়স্ কালে ঐ শক্তি এমত বৃদ্ধি পায় যে, তখন শিশু অনায়াসে দাঁড়াইতে পারে, এবং ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া চলিতে শিক্ষা করে।

শৈশবকালেই বিশেষরূপে শরীর সম্বর্দ্ধিত হয়। নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শরীর পূর্ণবয়সে যত উচ্চ হয়, ৩ বৎসর বয়স্ মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ হইয়া থাকে। ঐ ৩ বৎসরের মধ্যেও প্রথম বৎসরে যৎপরিমাণে উচ্চতা বৃদ্ধি হয়, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে ক্রমান্বয়ে তাহা অপেক্ষা ন্যূন হয়। এইরূপে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই অল্প পরিমাণে উচ্চতা বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের সমান উচ্চতা হয় না। পূর্ণাবস্থায় শরীর যত উচ্চ হয়, জন্মকালে পুরুষের শরীর প্রায় তাহার ৭ ভাগের দুই ভাগ উচ্চ থাকে;

স্ত্রীলোকের শরীর তাহা অপেক্ষা প্রায় এক ইঞ্চের ২০ ভাগের ভাগ ন্যূন থাকে; এবং যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ঐ ন্যূনতা তত বৃদ্ধি হয়। সকল স্থানে সমান নিয়মে শরীর বৃদ্ধি হয় না। অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে নাতিশীতোষ্ণ স্থানাপেক্ষা শরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি ত্বরায় সম্পাদিত হয়। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরে এবং পর্ব্বতীয় দেশ অপেক্ষা সমভূমিতেও শীঘ্র শীঘ্র শরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যত শীঘ্র শরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি হয়, উহার আয়তন তত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না। শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি হইলে অর্থাৎ পুরুষের চল্লিশ ও স্ত্রীলোকের পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাহাদিগের শরীর যত ভারী হইয়া থাকে, সদ্যোজাত শিশুর শরীর তাহা অপেক্ষা প্রায় বিংশতি ভাগের ভাগ ভারী দেখা যায়। জন্মের পর এক বৎসর বয়সের সময় ঐ ভার বৃদ্ধি হইয়া পরিমাণের প্রায় দশ ভাগের ভাগ হয়, এবং প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে শরীরের ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শরীরের পূর্ণাবস্থায় শরীরের যেরূপ আকার হইবে, প্রায় তদাকার সম্পন্ন হইয়া মনুষ্য শৈশবকাল পরি-

ত্যাগ করে। তৎকালে তাহার শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তাহার শরীরাস্থিতে মৃদ্‌ভাগের আধিক্য হয়, উহা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শক্তিশালী হয় এবং পেশীসমূহ বলবান্ ও স্থূল হইতে থাকে। বালককালে স্ত্রীলোকের স্বরের ন্যায় স্বরের ক্ষীণতা থাকে, যৌবনোন্মুখে তাহা গভীর হইয়া উঠে। শ্মশ্রুরাজি উদ্ভিন্ন হইয়া মুখমণ্ডল শোভিত করে। বক্ষঃস্থল বিশাল, উরুযুগল মাংসল, বাহুদ্বয় সবল, স্কন্ধদেশ পরিণদ্ধ হইতে থাকে।

এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এক সময়ে হয় না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীশরীরে শৈশবাপগমের চিহ্ন অল্প বয়সে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমমণ্ডলে ১৪ হইতে ১৬, শীত মণ্ডলে ১৪ হইতে ১৭। ১৮, এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে ১০। ১১ বৎসরের মধ্যেই স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থল উন্নত, স্কন্ধদ্বয় বিস্তৃত, বস্তি ও নিতম্ব দেশ প্রসারিত হয়।

পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স হইলে প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্তি হয়। তৎকালে শরীরের যে যে অস্থি কোমল থাকে, তাহা কঠিন হইতে থাকে, এবং তাহাদিগের ঘনত্বের ও বলশালিত্বের চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। শরীরপোষণী শক্তির কার্য্য কেবল অপচিত অংশের পরিপূরণেই পর্য্যাপ্ত হয়। মানসিক শক্তি সকল যৌবন-

কালের উগ্রতা পরিত্যাগ করে, এবং ভ্রান্তিজনক মনোরথ গাঢ় বিবেচনাকে স্থান দান করে। প্রবল উৎসাহিতা যে সকল কর্ম্ম অসাধ্য হইলেও সাধনতৎপর করিত, তাহাতে আর প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না; এবং পরিপক্ব বিবেচনা শক্তির কার্য্য বাহুল্য রূপে হইতে থাকে। ৬০ বৎসর বয়স্ হইলে সমুদায় মানসিক শক্তি প্রায় হ্রাস পড়িতে থাকে। পূর্ব্বে কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে ইচ্ছা হইত, এক্ষণে তাহাতে বিরক্তি বোধ হয়। আলস্য শরীরকে আশ্রয় করিতে থাকে। শরীরও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে; এবং তাহার চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়। অবশেষে শেষ দশা উপস্থিত হয়। অঙ্গাদি দুর্ব্বল হয়, চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়ে, শিরাবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে, কেশ সকল বিরল ও শুভ্রবর্ণ হয়, দন্তগুলিও একেএকে পড়িয়া যায়, পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়, রক্তসঞ্চার তাদৃশ বেগবান্ থাকে না, রক্তবহ প্রণালী সমুদায় এমত ঘন ও কঠিন হইতে থাকে, যে রক্ত হইতে পুষ্টিকর পদার্থ শরীরে যোজিত হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়াদির শক্তি থাকে না, দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া আইসে, কর্ণে আর তাদৃশ শ্রবণ করা যায় না, গতি মৃদু হইয়া উঠে, পেশীরা আর স্নায়ুর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে না, স্নায়ু ইচ্ছার বশীভূততা পরিত্যাগ করে,

অস্থি সকল বিশেষরূপ কঠিন ও ভঙ্গপ্রবণ হয়, স্বরের পরিষ্কারিতা অপগত হয়, এবং জড়তা ও নিস্তেজস্বিতা জন্মে। এই রূপে বর্ষে বর্ষে নাশের লক্ষণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরিশেষে শ্বাসক্রিয়া ও রক্তসঞ্চার রুদ্ধ হইয়া সংসার-বাসের অযোগ্য জীবনকে ইহলোক হইতে অন্তরিত করে।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেবল জরা উৎপন্ন হইয়া প্রাণ-ত্যাগ হওয়া অতি অল্প দেখাযায়। আমাদিগের কার্য্য দোষে পীড়া বা অন্য কারণেই প্রায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সচরাচর মনুষ্যকে যত দিবস জীবিত থাকিতে দেখা যায়, মনুষ্য যে তাহা অপেক্ষা অনেক কাল বাঁচিতে পারে, তাহার অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। পুরাকালের ঐতিহাসিক বা ঔপাখ্যানিক দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য না করিলেও ইদানীন্তন সময় হইতেও অনেক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে। ইয়র্ক-সায়র নিবাসী হেনরী জেঙ্কিন্স নামক জনৈক জাল-জীবী ১৫৭ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইয়া ১৬৬০ খৃঃ অব্দে দেহ পরিত্যাগ করে। ১৪০ বৎসরের পূর্ব্ব সঙ্ঘটিত কোন ঘটনা বিশেষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সে এক সময়ে বিচারালয়ে নীত হয়, তৎকালে তাহার দুই পুত্র সমভিব্যাহারে ছিল এবং সেই সময়ে তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের বয়স ১০২ ও কনিষ্ঠের ১০০ বৎসর হইয়া-

ছিল। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ দীর্ঘ জীবনের অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না। ফলতঃ যত্ন করিলে মনুষ্যরা যে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

অংসফলকাস্থি	Scapula.
অগ্র সামান্য বন্ধনী	Anterior common ligament.
অণ্ডবিল	Fenestra ovalis.
অর্দ্ধচক্র প্রণালী	Semicircular canal.
অধোজিহ্বিকা	Epiglottis.
অনপাসার্য্য	Resisting.
অনুপ্রস্থ প্রবর্দ্ধন	Transverse process.
অনৈচ্ছিক পেশী	Involuntary muscle.
অন্তঃকর্ণ	Internal ear.
অন্তশ্চারকতা	Permeability.
অন্তর্লসীকা	Endolymph.
অন্ননালী	Œsophagus.
অন্নরস	Chyle.
অন্ত্র	Intestine.
অন্ত্ররস	Intestinal juice.
অপপর্শুকা	False rib.
অবটু	The back part of the neck. (ঘাড়)

অভ্যন্তরীণ শ্রুতিপথ	Internal auditory meatus.
অম্লজান বায়ু	Oxygen gas.
অলিন্দ	Vestibule.

আমাশয়	Stomach.
আমাশয়িক রস	Gastric juice.
আলবুমেন	Albumen. শস্যাদির রসে, রক্ত ও মাংস ক্বাথে ইহা তরলাবস্থায় পাওয়া যায়। বাদাম, সর্ষপ প্রভৃতি দ্রব্যে ইহা কঠিনাকারেও দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় উহাকে জলের সহিত গুলিয়া মিশ্রিত করিতে পারাযায়। ডিম্বের মধ্যস্থ শুভ্রপদার্থ এবং রক্তস্থ মস্তুতে আলবুমেনের ভাগ অধিক। ঐ [illegible]দ্বয়ে কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া ১৫০ হইতে ১৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দিলে আলবুমেন জমিয়া যায়।
আস্রবগ্রন্থি	Lachrymal glands.

ঈক্ষণ	Lens.

উচ্ছ্রায় (ত্বকগত)	Papillœ.
উদজান-বায়ু	Hydrogen gas.
উদর-বিতান	Diaphragm.
উপগুল্ফ	Metatarsus.

উপজিহ্বা	Velum palati, or more properly the hanging extremity of it.
উপাস্থি	Cartilage.
উপস্থাস্থি	Pubis.
ঊর্বস্থি	Femoral bone, or, femur.

একযোগী-পেশী	Congenerate muscle.

ঐচ্ছিক-পেশী	Voluntary muscle.

ঔপাস্থিক	Cartilaginous.

কঙ্কাল	Skeleton.
কণ্টক প্রবর্দ্ধন	Spinous process.
কণ্ঠাস্থি	Clavicle.
কণ্ঠনালী	Trachea.
কর্ণদল	Auricle, or, the external. part of the ear.
কফোণি	Elbow.
করভ	Metacarpus.
করোটী	Skull.
কশেরুকা	vertebra.
কালল নল	Fallopian tube.

কিরণসংঘ — Pencil of rays.
কীলকাস্থি — Sphenoid bone.
কৈশিকা নাড়ী — Capillary.
ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক — Cerebellum.
ক্ষুধা — Hunger.

গতিজননী স্নায়ু — Nerve of motion.
গলগুহা — Pharynx.
গুল্‌ফ — Tarsus.
গোল বিল — Fenestra rotunda.
গ্রন্থিময় স্নায়ু — Ganglionic system of nerves.
গ্লুটেন — Gluten. তণ্ডুল, গোল-আলু ও গোধূম প্রভৃতি শস্যে ইহা পাওয়া যায়। শুষ্ক হইলে ইহা পিঙ্গলবর্ণ ও ভঙ্গ-প্রবণ হয়। অশুষ্কাবস্থায় ইহা ধূসরবর্ণ নিরীক্ষিত হয়।

ঘননির্য্যাস — Gum, ইহা স্বচ্ছ, বর্ণহীন স্বাদ-হীন ও গন্ধবিহীন। লোকে যাহাকে গঁদ বলিয়া থাকে তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত। সমুদায় উদ্ভিজ্জ বস্তুতে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে।
ঘর্ম্মস্রবণগ্রন্থি — Sudoriferous glands.
ঘ্রাণস্নায়ু — Olfactory nerve.

চক্রদন্তাস্থি	Radious.
চোয়ালাধঃ-গ্রন্থি	Submaxillary glands.

ছায়া পট	Retina.
ছেদন দন্ত	Incisor.

জঙ্ঘাস্থি	Tibia.
জত্রু	Shoulder joint.
জলীয় রস (নেত্রগত)	Aqueous humour.
জানু	Knee.
জিহ্বাধঃ গ্রন্থি	Sublingual glands.
জ্ঞানজননী স্নায়ু	Nerve of sensation.

ডিম্বকোষ	Graafian follicle.

ত্রিকাস্থি	Sacrum.

দন্তল কশেরুকা	Axis.
দন্তল প্রবর্দ্ধন	Odontoid process.
দীর্ঘীভূত মজ্জা	Medulla oblongata, or, the lengthened marrow.
দ্রবনির্য্যাস	Mucilage. ঘননির্য্যাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে; মসিনা প্রভৃতি অনেক উদ্ভিজ্জ বস্তুতে ইহা পাওয়া গিয়া থাকে।

দ্বাররক্ষী–পেশী	Pylorus
দ্বিমূল-পেশী	Biceps.
দ্ব্যম্লঅঙ্গারক বায়ু	Carbonic acid gas.
দ্ব্যগ্র দন্ত	Bicuspid,

ধমনী	Artery.

নবনীত	Butter.
নলকাস্থি	Fibula.
নিশ্বাস	Inspiration,
নেত্রচ্ছদ	Eyelid.
নৈত্রকাচ	Crystalline lens.
নৈত্রশৃঙ্গ	Cornea.

পঞ্জর	Thorax.
পটহচ্ছদ	Membrane of the tympanum.
পনীর	Cheese শুষ্ক আমিক্ষা নির্ম্মিত খাদ্যবিশেষ।
পশ্চাৎ কপালাস্থি	Occipital bone.
পশ্চাৎ সামান্য বন্ধনী	Posterior common. ligament.
পর্শুকা	Rib.
পাকযন্ত্র	Digestive apparatus.

পাকাশয়	Digestive canal.
পানীর্য্য-পদার্থ	Casein দুগ্ধস্থ যে পদার্থ হইতে পনীর প্রস্তুত হয়। ইহা সূত্রজনক পদার্থের ন্যায় আপনা হইতে জমিয়া যায় না; অথবা আলবুমেনের ন্যায় তাপ দ্বারা জমে না। কেবল অম্লসংযোগেই জমিয়া থাকে। ঔদ্ভিজ্জ অনেক বস্তুতে ইহা পাওয়া গিয়া থাকে।
পাললিক	Pancreas.
পাললিক রস	Pancreatic juice.
পার্শ্বকপালাস্থি	Parietal bone.
পার্ষ্ণি	Heel.
পিত্ত	Bile.
পৃষ্ঠবংশ	Spine.
পেশী	Muscle.
পেশী-চেল	Aponeuroses.
পেশী-নিবেশ	The *point of insertion* of a muscle.
পেশী-বটী	Tendon.
পেশীমূল	The *origin* of a muscle.
পেষণদন্ত	Molar teeth.
পৌষ্টিক খাদ্য	Plastic aliment.
প্রকোষ্ঠাস্থি	Ulna.
প্রগণ্ডাস্থি	Humerus.

প্রপদ	Toes.
প্রশ্বাস	Expiration.
প্রাণস্থান	Vital point.

ফুস্ফুস্	Lungs.
ফুস্ফুসীয় আমাশয়িক স্নায়ু	Pneumogastric nerve.
ফুস্ফুসীয় ধমনী	Pulmonary artery.
ফুস্ফুসীয় শিরা	Pulmonary vein.

বঙ্ক্ষণ-সন্ধি	Hip joint.
বন্ধনী	Ligament.
বহুচ্ছিদ্রাস্থি	Ethmoid bone.
বর্ণিলচ্ছদ	Iris.
বসাস্রবণ-গ্রন্থি	Sebaceous gland.
বস্তি	Pelvis.
বহিঃকর্ণ	External ear.
বহিষ্পথ (কর্ণগত)	External meatus.
বহিস্ত্বক্	Epidermis.
বিপরীতাচারী পেশী	Antagonistic muscle.
বিসারণ	The act of diverging from a certain point.
বিসারী ঈক্ষণ	Divergent lens.
বুকাস্থি	Sternum.
বুভুক্ষা	Appetite.

বৃহন্মস্তিষ্ক	Cerebrum.
ভাসমান পর্শুকা	Floating rib.
ভ্রূণ	Embryo.
মণিবন্ধ	Carpus.
মধ্যকর্ণ	Middle ear.
মধ্যত্বক্	Derma.
মধ্যাবরণ (নেত্রগত)	Choroid.
মস্তু	Serum.
মস্তিষ্ক	Brain, or, encephalon.
মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু	Cerebro spinal system of nerves.
মুখ গহ্বর	Buccal cavity.
মেরুদণ্ডগত-মজ্জা	Spinal marrow.
যকৃৎ	Liver.
যবক্ষারজান বায়ু	Nitrogen gas.
যবক্ষারজানবিশিষ্ট খাদ্য	Nitrogenised aliment.
যবক্ষার বিহীন খাদ্য	Nonnitrogenised aliment.
রোমন্থিক	Ruminant.
ললাটাস্থি	Frontal bone.

লসীকা	Lymph.
লসীকাবহ নাড়ী	Lymphatics.
লালা	Saliva.
লালাস্রবণ-গ্রন্থি	Salivary gland.

শঙ্খনখ	Cochlea.
শঙ্খাস্থি	Temporal bone.
শব্দজনক	Sonorous bodies.
শ্বদন্ত	Canine.
শ্রবণস্নায়ু	Auditory nerve.
শ্বাস	Respiration.
শিটি	Feculent matter.
শিরা	Vein.
শিরোধি কশেরুকা	Atlas.
শিলাস্থি	Petrous bone.
শুক্তিদেশ্য	Concha.
শ্বেতচ্ছদ	Sclerotica.
শ্বেতডিম্ব	White globules.
শ্বেতডিম্বাণু	White globulines.
শ্বেতসার	Starch ইহা তুষারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, দেখিতে উজ্জ্বল, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে অল্প শব্দ হইয়া থাকে। উদ্ভিদমণ্ডলে ইহা বিশেষরূপে বিস্তৃত। গোধূম, গোল-আলু, আরোরুট, গাজর, অপক্ব পিয়ারা,

আতা, শীম, মটর, কলাই প্রভৃতিতে ইহা বহুল পরিমাণে আছে। বৃক্ষ-বিশেষের শাখায়, দারুচিনি প্রভৃতি বল্কলেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত, মস্তিষ্ক এবং জন্তু শরীরের অন্যান্য অংশেও উহা পাওয়া গিয়াছে। ময়দা ও গোলআলু হইতে উহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। জল দিয়া বস্ত্রের উপরি ময়দা চটকাইলে জলের সহিত শ্বেতসার নিম্নে নির্গত হয়; গ্লুটেন উপরে থাকিয়া যায়। ঐরূপ নির্গত জল কোন পাত্রে ধরিলে তাহাতে শ্বেতসার জমিয়া থাকে।

শৈঙ্ঘাণত্বক্	Pituitary membrane.
শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্	Mucous membrane.
শোণবিন্দু	Red corpuscles.

সমকেন্দ্রিক	Concentrical.
সমাহরণ	The act of converging to a certain point.
সমাহারী ঈক্ষণ	Convergent lens.
সূত্রজনক পদার্থ	Fibrine.
সৌত্রিক	Fibrous.
স্নায়ু	Nerve.
স্নায়ু-রজ্জু	Nervous cord.
স্নায়ুসূত্র	Nervous filament.

স্নৈহিক	Oleaginous.
স্যূত সন্ধি	Suture.
স্রবণ	Secretion.
স্বরপ্রভব	Glottis.
স্বরযন্ত্র	Larynx.
স্বারতন্ত্র	Vocal cord.
স্ফাটিকরস	Vitreous humour.

হৃৎকোষ	Auricle of the heart.
হৃদুদর	Ventricle of the heart.
